রাগ ভৈরব

বিমল মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : ১লা বৈশাখ ১৩৭১

উৎসর্গ

শ্রীমান্ অমিত চট্টোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু,—

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্য জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি শতাধিক উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অপরের প্রশংসা যেমন আমার প্রাপ্য হওয়া উচিত নয়, অপরের নিন্দা সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। অথচ প্রত্যহই আমাকে সেই দায় বহন করতে হচ্ছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের উদ্দেশে আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

The punishment, that the wise and good men of a country who decline to take interest in the affairs of their country must suffer—is to be gladly ruled by the rest, viz, fools and knaves.

PLATO.

রাগ ভৈরব

নস্কর-বাগান লেন বড় বনেদী পাড়া। বনেদী মানে এই নয় যে সেকালের বড় বড় বনেদী বংশ সেখানে বাস করে। বনেদী মানে বহুকালের পুরোন রাস্তা। এককালে হয়ত এমন ইলেকট্রিক লাইট ছিল না, এমন পিচের রাস্তাও ছিল না। এমন পাকা দোতলা তিনতলা বাড়িও ছিল না।

তা বলতে গেলে কোন্ পাড়াতেই বা তা ছিল!

এমন বহু লোক এখনও কলকাতা সহরে বেঁচে আছে যারা সেই পুরোন কলকাতার চেহারা দেখেছে। সেই ঘোঁড়ায় টানা গাড়ি দিয়ে রাস্তায় জল দেওয়া, সেই কেরোসিন তেলের বাতিতে আলো জ্বালানো, আর ঘোঁড়ার গাড়ির মাথায় বাক্স-প্যাঁটরা চাপিয়ে শেয়ালদ' ইষ্টিশান থেকে বাড়িতে ফেরা।

সে-সব দিন আর এখন নেই। নেই বলেই নস্কর-বাগান লেনের চেহারাও বদলে গেছে। আগে যেখানটায় পানা-পুকুর ছিল সেখানে এখন দেবসুন্দরবাবু নতুন তিন-তলা বাড়ি করে ফেলেছেন।

রিটায়ার করার পর দেবসুন্দরবাবু এই নস্কর-বাগান লেনে বাড়ি করে ভেবেছিলেন বুঝি এক মহা কীর্তি করে ফেললেন। আর আজ-কালকার দিনে কলকাতা সহরে বাড়ি করাও তো একটা কীর্তি বটে! যেখানে পঞ্চাশ-ষাট টাকা দরে কাঠা দিলেও কেউ ছুঁতো না, সেইখানেই এখন পাঁচ হাজার টাকা হাতে নিয়ে খদ্দেরদের ঝুলোঝুলি।

করুণাকান্তবাবু মাঝে মাঝে আসেন।

জিজ্ঞেস করেন—জমি কী দরে কিনলেন?

দেবসুন্দরবাবু বলেন—পাঁচ হাজার টাকা করে কাঠা—

করুণাকান্তবাবু বলেন—খুব সস্তায় পেয়ে গেছেন মশাই, এখন হেরম্ববাবু কিনলেন সাত হাজার দরে—

হেরম্ববাবুও বাড়ি করেছেন সামনেই। দেবসুন্দরবাবু একদিন পায়ে-পায়ে গিয়ে হেরম্ববাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়ান। সেখানে চুণ-সুরকি-সিমেণ্টের পাহাড়। রাজমিস্ত্রি কুলি-মজুর খাটছে। আর হেরম্ববাবু ঝাঁ-ঝাঁ রোদের মধ্যে বাড়ি-তৈরি তদারক করছেন।

দেবসুন্দরবাবুকে দেখে বললেন—নমস্কার। আপনি?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—এই আপনার বাড়ি দেখতে এলুম। জমি কত করে কিনলেন মশাই আপনি? আমিও বাড়ি করেছি কি না···

এমনি করেই পাড়ার নতুন অধিবাসীদের মধ্যে ভাব হয়ে গেল। আসা-যাওয়া চলতে লাগলো। এককালে নস্কর-বাগান লেন ছিল আঁকা-বাঁকা খোয়ার রাস্তা আর দু'চারটে নোনা-ইঁটের পুরোন ধাঁচের ভাঙা বাড়ি। আর অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল বাগান। নস্কর-বাগান লেনের আদি বাসিন্দা নস্করবাবুদের বাগান। আম-জাম-নারকোল-তালের গাছ আর পানা পুকুর।

সে-যুগের সে কলকাতা এ-যুগে আর মানায় না। বাগান এখন বিলাসিতা। তুমি বাগান চাইলেও কলকাতা-করপোরেশান তোমার বাগান রাখতে দেবে না। রাখলে মোটা ট্যাক্স চাপাবে। তাই নস্করবাবুরা প্লট্ করে জমি বিক্রি করে দিলে। বাইরের লোক জমি কিনতে পায় না। তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো নস্কর-বাগানে।

তখন থেকেই এই নস্কর-বাগান লেনের রব্-রবা। এক-এক করে বাড়ি তৈরি হতে লাগলো। কিছু আগেকার পুরোন বাসিন্দা, আর কিছু নতুন আমদানি। অর্থাৎ পাঁচ মিশেলি প্রতিবেশী। এক পাড়ায় এক সঙ্গে বসবাস, বাজার করতে গেলে একই লোকের সঙ্গে রোজ মুখোমুখি, সেইটুকুতেই যা-কিছু চেনা-জানা-শোনা। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। তার চেয়ে বাড়তি কিছু নয়।

পাড়া যখন গম্-গম্ করে উঠলো তখন রাস্তা দিয়ে লোকে

চলাচল বাড়লো। আশেপাশের বড়-রাস্তা দিয়ে বাসের নতুন রুট্ হলো। তখন আর অফিস যাবার জন্যে ছেলে-ছোকরাদের হেঁটে হেঁটে কাহিল হতে হলো না। নস্কর-বাগান লেনটা পেরিয়ে গিয়ে মোড়ের পার্কটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই হলো। সেখানে বাসের নতুন স্টপেজ। সেখান থেকে উঠলেই সোজা ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিস-পাড়ায় চলে যাও। ছ' পয়সা খরচ করলেই একেবারে কর্মস্থল। এ কি একটা কম সুবিধে ?

তাই নস্কর-বাগান লেনের জমির দাম বাড়লো। তাই নস্কর-বাগান লেনের বাড়ির চাহিদা বাড়লো, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভাড়াও বাড়লো, নতুন ভাড়াটেরা আসবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার লোকসংখ্যাও যেমন বাড়লো তেমনি বাড়লো অচেনা লোকের ভিড়। বাড়িতে বাড়িতে যেমন নতুন লোকের আনা-গোনা সুরু হলো তেমনি জানালায় ঝুলতে লাগলো নতুন-নতুন পর্দা। নতুন-নতুন মুখ, নতুন-নতুন পরিবেশ। এ যেন সেই নতুন লোকের বসবাস সুরু হলেও এ-পাড়ার বনেদী গন্ধটা গেল না।

এখন সন্ধ্যে হলেই যার-যার বাড়িতে রেডিও বাজে। নতুন-নতুন গান, নতুন-নতুন সুর। বাঙলা গান কারো রেডিওতে বাজে না। শুধু হিন্দী গান। বোম্বাই ফিল্মের লচক্দার গীত।

হেরম্ববাবুর মাথা ধরে ওঠে। ব্লাড-প্রেসারের রুগী হেরম্ববাবু। বাড়ি করতে গিয়েই তাঁর পরমায়ু নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার ওপর হিন্দী ফিল্মী-গানের চাপ। এক-একটা বাড়ির ছেলে-মেয়েরা নতুন কেনা রেডিওগুলো ফুল-ফোসে খুলে দেয়। আওয়াজটা সারা পাড়ায় গাঁক-গাঁক করে ওঠে। যাদের ভালো লাগে তারা তালে-তালে তাল ঠোকে, কিন্তু যাদের ভালো লাগে না তাদেরই বিপদ।

দেবসুন্দরবাবুর ভালো লাগে না। পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে বলেন—কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলবো ?—

ভদ্রলোক বলেন—কী বলুন—

দেবসুন্দরবাবু বলেন—আপনার বাড়ির রেডিওটা একটু আস্তে বাজাতে পারেন না—

ভদ্রলোক বলেন—আরে মশাই, ছেলেমেয়েদের তো আমিও তাই বলি। রেডিও শুনবি তোরা শোন্, কিন্তু একটু আস্তে বাজা না বাপু—তা, আজকালকার ছেলে-মেয়েরা কি বাপ-মায়ের কথা শোনে! আপনার বাড়িতেও তো ছেলে-মেয়েরা আছে, আপনিও তো জানেন—

দেবসুন্দরবাবুরও ছেলে-মেয়ে আছে। তবে তারা বড় হয়েছে। বড় হয়ে সব বাঙলা দেশের বাইরে চলে গেছে। কেউ চাকরি করছে সেখানে। কারো আবার বিয়ে হবার পর শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে।

দেবসুন্দরবাবু আর কী বলবেন! কিছুই তাঁর বলবার থাকে না। নস্কর-বাগান লেনের বাসিন্দারা যেন বিরাট কলকাতারই একটা ছোট সংস্করণ। তাদের অভিযোগ অনুযোগ তা সে যত বড় আর যত ছোটই হোক, তার যেন কোথাও কোনও প্রতিকার নেই, আপিল নেই, আর তাই তার ফয়শালা-মীমাংসাও নেই। নস্কর-বাগান লেনের বাসিন্দারা যখন ট্রামে-বাসে ওঠে, ভিড় নিয়ে, ঘেঁষা-ঘেঁষি নিয়ে বচসা হয়, একজনের জুতো আর একজন মাড়িয়ে দিলে কথা-কাটাকাটি হয়, তখন সকলেরই রক্ত খানিক ক্ষণের জন্যে গরম হয়ে ওঠে। তারপর আপনাআপনিই আবার তা থেমে যায়। কখনও দু'একটা বোমা ফাটে, ট্রাম-বাস জ্বলে ওঠে। তারপর আবার সহর চলে। নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নেই চলে। যেন না-চললে সমস্ত কিছু অচল হয় বলেই চলে।

এর কোনও প্রতিকার নেই। প্রতিকার চাইলেও প্রতিকার পাওয়ার উপায় নেই। কে প্রতিকার চাইবে, আর কে-ই বা প্রতিকার করবে? প্রতিকার চাইবার মানুষ যেমন নেই, প্রতিকার করবার সংস্থারও তো তেমনি অভাব। নস্কর-বাগান লেনের বিধাতা পুরুষের মত বাঙলা-দেশের বিধাতা পুরুষও বুঝি ইন্তেকাল করেছেন।

তাই যখন নস্কর-বাগান লেনের বাড়িগুলোতে রেডিও বাজে,

অনুষ্ঠানে উৎসবে লাউড্-স্পীকার চিৎকার করে, তখন নিরুপায় হয়ে সবাই সব কিছু সহ্য করে।

বলে—আঃ, আর পারি নে এদের জ্বালায়—

কিন্তু লাউড্-স্পীকার তো নিরস যন্ত্রই শুধু। সে মানুষের যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপ করে না। সে একমনে বোম্বাই সিনেমার দুর্বোধ্য যন্ত্রণাগুলো ভাষা দিয়ে মানুষের করোনারিতে গিয়ে আঘাত করে। ঘা দেয় আর আর্তনাদ করে করে সকলকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

এই সময়ে একদিন করুণাকান্তবাবুর বাড়িতে এক ভাড়াটে এল।

করুণাকান্তবাবু তখন আহ্নিক শেষ করে সবে উঠেছেন, এমন সময় নিচে থেকে ডাক এল।

নিচেয় এসে দেখলেন একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস। মাজা-ঘষা গায়ের রং। বেশ চটপটে, ছটফটে, চনমনে ভাব।

মেয়েটি ঘরটা দেখলে। ঘরের লাগোয়া একটা ঢাকা বারান্দা।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে—কল? কল কোথায়?

করুণাকান্তবাবু বললেন—ওই যে, ওই উঠোনের কোণে—

বলে আঙুল দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে দিলেন। প্রভাও চেয়ে দেখলে সেদিকে। বড় জোর এক হাত কি দেড় হাত উঠোন। ওপরে টিনের চাল।

করুণাকান্তবাবু তখন একমনে মেয়েটার সিঁথির দিকে চেয়ে দেখছিলেন। সিঁদুর-টিদুর কিছু নেই। তবে কি বিয়ে হয়নি নাকি?

—তুমি কি একলাই থাকবে নাকি মা?

প্রভা বললে—হ্যাঁ—

—তোমার সঙ্গে আর কেউ থাকবে না?

প্রভা বললে—সঙ্গে যদি কেউ না থাকে তো আপনার কি আপত্তি আছে?

করুণাকান্তবাবু একটু হাসতে চেষ্টা করলেন।

বললেন—না না, আপত্তি হবে কেন ? আমি এমনিই জিজ্ঞেস করছি। তুমি মা একলা থাকলে তো আমারও দায়িত্ব বাড়লো। মানে আমাকে একটু দেখাশোনা করতে হবে তো। আজকাল কলকাতার অবস্থা তো ভালো নয়।

প্রভা বললে—না, তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি বাঙলা দেশে মানুষ হইনি। আমি রায়পুর থেকে এখানে চাকরি নিয়ে এসেছি—

—কোথায় চাকরি করো মা তুমি ?

—গার্লস্ স্কুলে। তীর্থময়ী বালিকা বিদ্যালয়। আমার সম্বন্ধে যদি কিছু খোঁজ-খবর নিতে চান তো নিতে পারেন। আপনার ভাড়া আমি ঠিক নিয়ম করে মাসের প্রথম সপ্তায় দিয়ে দেব। আর যেদিন ভাড়া দিতে পারবো না সেদিন আপনার বাড়ি ছেড়ে দেব, কথা দিচ্ছি—

কথা একরকম সেইদিনই পাকা হয়ে গেল। বাড়ির ভেতরে যেতেই করুণাকান্তবাবুর বউ বললে—মেয়েটা কে ?

করুণাকান্তবাবু বললেন—একটা ইস্কুল-মাস্টারনী।

—তা মেয়েটার বর কী করে ?

—বিয়ে হয়নি এখনও।

বউ অবাক হয়ে গেল। বিয়ে যদি হয়নি তো সঙ্গে কে থাকবে ?

—কেউ না।

—ওমা, ওই সোমত্থ মেয়েকে তুমি ঘর-ভাড়া দিলে ? শেষকালে যদি আবার বাইরের কাউকে জুটিয়ে বাড়ির ভেতরে রাখে ? তখন ?

করুণাকান্তবাবু বললেন—তা রাখে তো রাখবে। তাতে যার চরিত্র খারাপ হবে তার খারাপ হবে, তাতে তোমারই বা কী আমারই বা কী ? তখন যাদের মেয়ে তারা বুঝবে—

ঘরটা ঘুপচি বলে অনেকে এসে ফিরে গেছে। কারোর পছন্দ

হয়নি এতকাল। নইলে নস্কর-বাগান লেনে বাড়ি এতদিন খালি পড়ে থাকে না।

তা প্রভা একদিন এল এই বারো নম্বর নস্কর-বাগান লেনে। আসার পর প্রথম রাত্রেই সেই রেডিওর গান। বোম্বাই-ফিল্মের হাল্লা-গুল্লা। কান ঝালাপালা হয়ে গেল প্রভার।

অনেক রাত পর্যন্ত চললো সেই গান। কোনও গান হাসতে হাসতে, কোনও গান লাফাতে লাফাতে। সমস্ত পাড়া মাত হয়ে গেল সেই গানের পাগলামিতে। প্রভার মনে হলো সে নিজেও বুঝি পাগল হয়ে যাবে—

তারপর বিছানা ছেড়ে উঠলো···

আর তারপর···

কিন্তু তার আগে আর একটা দিনের আর একটা দেশের আর একটা ঘটনা বলে নিই ঃ

১৯৪০ সালের ১০ই মে। হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে জার্মানির। গরীব দেশ হল্যাণ্ড। জার্মানির তুলনায় তার না আছে ঢাল, না আছে তরোয়াল। তবু লড়াইয়ে হেরে গেলে চলবে না। তাহলে কীসের দেশপ্রেম, কীসের মাতৃভূমি! মাতৃভূমির অপমান তো দেশবাসীর অপমান। দেখতে দেখতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে দেশের মধ্যে। তারা কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেনি এমন করে জার্মানি তাদের ওপর একদিন হঠাৎ হামলা করবে।

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তার লোভ নয়, তার বিলাসিতা নয়, তার পাপ নয়, তার অমিতব্যয়িতা নয়, কিছু নয়। তার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মানুষ। জার্মানি তার নিজের যত ক্ষতি করেছে, রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন বা আর কেউ তা করতে পারেনি।

রাতারাতি হল্যাণ্ডের জেনারেলরা মিটিং করতে বসলেন।

একজন জেনারেল বললেন—জার্মানির তুলনায় আমরা কতটুকু? আমাদের সামর্থ্যই বা কতটুকু? আমরা কী নিয়ে লড়বো?

আর একজন জেনারেল বললেন—জার্মানির সঙ্গে প্যাক্ট করাই ভালো—

মিটিং-এ আরো অনেকে বসেছিলেন। শিয়রে দুর্দান্ত শত্রু। যে কোনও মুহূর্তে শত্রু এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তখন বাজে কথা বলে নষ্ট করবার মত সময় নেই কারো। সীমান্তের লোক ঘড়-বাড়ি ছেড়ে সরে পড়তে আরম্ভ করেছে। সমস্ত দেশ সন্ত্রস্ত। যে কোনও মুহূর্তে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হতে পারে।

—চুপ করুন!

শব্দ শুনে যে-যেখানে ছিল সেইদিকে চেয়ে দেখলে।

হল্যাণ্ডের কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ্ দাঁড়িয়ে উঠেছেন।

—আপনারা প্রাণ দিতে পারবেন? প্রাণ? লাইফ?

সমস্ত ঘরখানা কম্যাণ্ডার-ইন-চিফের কথায় গম-গম করে উঠলো।

—আপনারা প্রাণ দিতে যদি রাজী থাকেন তো বলুন। নইলে আপনাদের সকলকে আমি ডিসচার্জ করে দেব। আমি নতুন জেনারেল অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করবো, যারা প্রাণ দেবে। আপনারা যদি প্রাণ দিতে রাজী থাকেন তো বলুন। বলুন—হ্যাঁ কি না—

কম্যাণ্ডার-ইন-চিফের কথা, কে আর আপত্তি করবে? সবাই একবাক্যে বলে উঠলো—হ্যাঁ—

—প্রাণ দেবেন?

—হ্যাঁ, প্রাণ দেব।

সঙ্গে সঙ্গে মিটিং শেষ হয়ে গেল।

মানুষের ইতিহাসে সে এক বিরাট রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা। পৃথিবীময় বেজে উঠলো রণ-দামামা। মানুষকে লোভ ত্যাগ করতে হবে, বিলাসিতা ত্যাগ করতে হবে, পাপ ত্যাগ করতে হবে, অমিতব্যয়িতা ত্যাগ করতে হবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করতে হবে তার প্রাণ।

সেই প্রাণ ত্যাগ করবার জন্যেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল সেদিনকার সেই হল্যাণ্ডে।

কিন্তু সেই দুর্যোগের দিনে হঠাৎ আবার আর এক কাণ্ড হলো। বলা নেই কওয়া নেই, দেশের সব জায়গায় একসঙ্গে হঠাৎ আলো নিভে গেল।

সমস্ত হল্যাণ্ড তখন অন্ধকার। আলো নেই, পাখা নেই, জল নেই, কাজ-কর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। কে এমন সর্বনাশ করলে? এ কি অন্তর্ঘাত?

হার মেজেস্টির রাজ্যে সোর-গোল পড়ে গেল চারদিকে। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল সর্বত্র। কোথায় এর মূল? কে এই বিপর্যয়ের

উৎস ? তাকে ধরে আনো, তার বিচার করো, তাকে ফাঁসি দাও।

সমস্ত দেশে তোলপাড় সুরু হলো সঙ্গে সঙ্গে। বিপর্যয়ের উৎস খুঁজতে হার মেজেস্টির পুলিশ মিলিটারী গোয়েন্দা, মেকানিক সবাই হিমসিম খেয়ে গেল। অর্ডার হলো—কালপ্রিটকে খুঁজে বার করতেই হবে। আর কালপ্রিটকে যদি খুঁজে না-ও পাও তো অন্তত পাওয়ার-হাউসটা মেরামত করে আবার চালু করো। আমরা আলো চাই, হাওয়া চাই, জল চাই। আমরা বাঁচতে চাই। আমরা জার্মানির ফুরর হিটলারের সঙ্গে লড়াই করতে চাই।

—তারপর ? তারপর কী হলো ?

—তারপরের কথা বলবার আগে আপনাকে আর একটা কাহিনী বলি।

কাহিনী মানে বানানো গল্প নয়।

আপনি তো এ-যুগে বাস করেন। এ যুগেও আর একটা যুদ্ধ বেধেছে আমাদের দেশে। আপনি আমি আরো সবাই সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি।

আমাদের শত্রুরাও এবার আমাদের দেশে হামলা করেছে। আমাদের দেশেও হঠাৎ সব আলো নিভে গেছে। আমরাও খুঁজে বেড়াচ্ছি চারদিকে। কোথায় এর মূল ? কে এই বিপর্যয়ের উৎস ? তাকে ধরে আনো, তার বিচার করো, তাকে ফাঁসি দাও। আমরা আলো চাই, হাওয়া চাই, জল চাই। আমরাও প্রাণ দিয়ে আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করতে চাই—

—তারপর কী হলো ?

—তারপরের ঘটনাটা শুনতে গেলে আমার এই কাহিনী শুনতে হবে। শুনবেন ?

বললাম—বলুন—

—তবে শুনুন—

ভৈরববাবু যখন নস্কর-বাগানে মেয়ের বাড়িতে এলেন তখন সেখানেও সেই একই অবস্থা।

বরাবর বাইরে চাকরি করেছেন ভৈরববাবু। রায়পুরের মিউনিসিপ্যালিটির বড়বাবু ছিলেন চল্লিশ বছর।

লোকে বলতো—ভৈরব-সাহাব সাঁচ্চা আদমি—

ভাগ্যের কোন্ এক তাড়নায় ছোটবেলাতেই মধ্য-প্রদেশে গিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ভাগ্য ফেরাতে দেশ-দেশান্তর ঘুরতে ঘুরতে সেদিন কাঁহা কাঁহা চলে গিয়েছিলেন তার ঠিক নেই। কখনও পায়ে হেঁটে কখনও ট্রেনে চড়ে, কখনও বা টাঙায় চড়ে। তখন বোধ হয় ভৈরববাবুর পায়ে চাকা ছিল। ঘুরতে তাঁর কষ্ট হতো না। তা আজও যে তাঁর স্বাস্থ্য এখনও চালু রয়েছে, তা কেবল ওই পায়ের জন্যেই হয়ত।

ভৈরববাবু বলতেন—যেদিন আমার পায়ের চাকা থেমে যাবে সেদিনই আমি শুয়ে পড়বো হে, আর উঠবো না—

প্রভা রাগ করে। বলে—কিন্তু বাবা, এ তো আমাদের রায়পুর নয়, এ কলকাতা। এখানে তুমি কোথায় হাঁটবে?

ভৈরববাবু বলেন—কোন রাস্তায়? সরকারি রাস্তা পড়ে রয়েছে, আমার যেখানে খুশী হাঁটবো। কে আমায় বারণ করবে শুনি?

প্রভা বলে—বা রে, কলকাতার রাস্তা কি আমাদের সেই রায়পুরের মতন? এখানে ট্রাম-বাস একেবারে ঝড়ের মতন মানুষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। তুমি তো জানো না বাবা, এ বড় বিচ্ছিরি জায়গা।

—বিচ্ছিরি জায়গা মানে?

—বিচ্ছিরি জায়গা মানে এখানে কারো জন্যে কারো মায়াদয়া নেই। যে যেমন করে পারে আগে যাবে। তাতে তোমার পা-ই মাড়িয়ে দিক আর চশমাই পড়ে যাক। বুড়ো-মানুষ বলে কেউ এখানে তোমাকে রেহাই দেবে না, তা জেনে রেখো—

কিন্তু ভৈরববাবু সে-সব কথায় কান দেবার লোক নন। তিনি বলেন—তা বলে আমি সারাদিন বাড়িতে বসে-বসে কী করবো? ভেরেণ্ডা ভাজবো?

তা সত্যি। ভৈরববাবু কাজের লোক। সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মধ্যপ্রদেশ যেমন ঠাণ্ডা দেশ, তেমনি আবার গরমও। আসলে গরমটাই যেন অনুপাতে বেশি। গরমের দিনে রাত নটা পর্যন্ত লু চলতো সেখানে। তবু ভৈরববাবুর ক্লান্তি ছিল না। লোকজন না এলে নিজেই কুড়ুল দিয়ে কাঠ কেটেছেন, নিজের হাতে গরুর দুধ দুয়েছেন। ঘর ঝাঁট দিয়েছেন, আবার ঘরের মেজেও মুছেছেন। দরকার হলে নিজের হাতে রান্নাও করেছেন। ওই মেয়েকে খাইয়ে ইস্কুলে পাঠিয়েছেন, আর তারপর ঘর-দোর বন্ধ করে তালাচাবি দিয়ে অফিসে ফাইল সাফ করেছেন।

তা অফিসে কাজই কি কম ছিল নাকি?

আজকালকার তো সব সাহেব। কোট-প্যাণ্ট-টাই পরে বাবুরা এদানি সব সাহেব হয়ে গিয়েছিল। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ফাইল পাঠাবে, তাও চাপরাশি চাই। চাপরাশি না হলে এক গেলাস চা এনেও খেতে পারবে না বাবুরা।

কিন্তু বড়বাবু হলে কী হবে, তাঁর কোনও ঝুটা ইজ্জতবোধ ছিল না।

বলতেন—দাও হে, ফাইলটা আমাকে দাও, আমি ফাইল দিয়ে আসছি ও-ঘরে—

বাবুরা একটু লজ্জায় পড়তো।

ভৈরববাবু বলতেন—চাপরাশিরাও মানুষ হে, তাদের অত হতচ্ছেদ্দা করতে নেই। যদ্দিন আমার হাতে-পায়ে বাত না হচ্ছে

তদ্দিন আমিই তোমাদের চাপরাশির কাজ করবো, দাও, ফাইলটা আমাকে দাও—

গৃহিণী যখন মারা গেলেন, তখন ওই প্রভাকে কে মানুষ করেছে শুনি? কে তাকে খাইয়েছে, ঘুম পাড়িয়েছে আর সেবা-যত্ন করেছে? এই রকমের মানুষ ভৈরববাবু। চেয়ারম্যান ছিল মহাজন সাহেব। মহাজন সাহেব মানুষটি ভারি ভাল। একদিন নিজেই হঠাৎ এসে পড়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। এসে তাঁর গামছা-পরা চেহারা দেখে অবাক। ভৈরববাবু তখন স্নান করবার আগে খালি গায়ে গামছা পরে ঝাঁটা হাতে উঠোন সাফ করছিলেন।

চেয়ারম্যান মহাজন সাহেব বললেন—এ কী, আপনার নোকর-ওকোর কেউ নেই?

ভৈরববাবু বললেন—আমিই তো আমার নিজের নোকর মহাজন সাহেব, আমি আবার নোকর রাখবো কী জন্যে?

বলে হো-হো করে হাসতে লাগলেন ভৈরববাবু।

তারপর সেই রায়পুরেই প্রভা এর-ওর কোলে বড় হতে লাগলো। বড় হয়ে ইস্কুলে পড়তে গেল। কলেজ থেকেও একদিন পাশ করে বেরোল। তারপর এই কলকাতার নস্কর-বাগানে একটা চাকরি পেয়ে গেল।

বাপ জানেই না কিছু। অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটারটা দেখাতেই ভৈরববাবু অবাক।

—ওমা, তুই কবে দরখাস্ত করলি, আর কবেই বা তোর চাকরি হলো?

প্রভা মিটিমিটি হাসছিল। বললে—তোমাকে কিছু বলিনি বাবা—জানি, বললে তুমি আপত্তি করবে—

—তা সেখানে যে যাচ্ছিস, কোথায় থাকবি? কী খাবি? কে তোর দেখাশুনো করবে?

প্রভা বললে—সে আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। একটা ঘর ভাড়া করে দিয়েছে আমার এক বন্ধু। সেও ওই ইস্কুলের টিচার—

—খাওয়া-দাওয়া ?

প্রভা বললে—সে আমি যেমন করে হোক রান্না-বান্না করে নেব! আর না-হয় একটা কুকার কিনবো—

ভৈরববাবু তো শুনে অবাক। এইটুকু মেয়ে নিজে রান্না করে খাবে, বিদেশ-বিভুঁই-এ পড়ে থাকবে, সে কেমন কথা! কলকাতায় তো আত্মীয়-স্বজন কেউ তেমন নেই যে সেখানে থেকে চাকরি করবার ব্যবস্থা করবে।

—তাহলে তাই-ই যাও মা। কিন্তু আমি তো মা এখন তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না। আমার যে আবার অফিস রয়েছে। এখন ইয়ার-এন্‌ডিং বাজেটের কাজ চলছে, এখন তো ছুটিও পাওয়া যাবে না।

তা সেই প্রভা তখন থেকে এই নস্কর-বাগানের বাড়িতেই এসে রয়েছে। দেড়খানা ঘর। সেই ঘরের ভাড়াই তখন দিতে হতো কুড়ি টাকা। তা বেড়ে বেড়ে এখন-চল্লিশ হয়েছে। আর বাড়িওয়ালাও লোকটি তেমন খারাপ নয়—

মেয়েকে একদিন ট্রেনে তুলে দিলেন ভৈরববাবু। তারপর কলকাতায় গিয়ে প্রভা চিঠি লিখলে যে, সে নিরাপদে নির্বিঘ্নে গিয়ে কলকাতায় পৌঁছেছে।

তারপর থেকে অনেক চিঠি লিখেছে প্রভা। প্রত্যেকবারই লিখেছে—সে ভালো আছে।···ভালো থাকলেই ভালো। ভৈরববাবু প্রত্যেকবারই চিঠিতে লিখেছেন স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে। —স্বাস্থ্যটাই হচ্ছে আসল মা। টাকার আমার দরকার নেই। আমার যা মাইনে তাতে আমি পরম নিশ্চিন্তেই আছি। আমার জন্য চিন্তা করো না।

এসব অনেকদিন আগেকার ব্যাপার। গরমের ছুটির সময় প্রভা প্রথম-প্রথম বাবার কাছে এসেছে। বাবা জিজ্ঞেস করেছেন—কী রে, কোনও অসুবিধে হয় না তো তোর সেখানে ?

প্রভা বলেছে—কী যে তুমি বলো বাবা, আমি কি কচি খুকি আছি আর আগের মতন ?

—কী রাঁধিস রোজ ?

প্রভা হাসতে লাগলো।

বললে—তুমি যে কী বাবা, তার ঠিক নেই! আমি কি আর কালিয়া-পোলোয়া রাঁধবো নাকি? শুধু ভাতে-ভাত আর ডাল রান্না করেই আমি ইস্কুলে চলে যাই। তারপরে কাছেই তো ইস্কুল, দুপুরবেলা এসে খেয়ে নিই। দুপুর বারোটার মধ্যে আমার ছুটি হয়ে যায়—

কিন্তু গরমের ছুটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে আসে। তখন আবার কলকাতা ফেরবার পালা। ভৈরববাবু আবার একদিন মেয়েকে বোম্বাই মেলে তুলে দিয়ে আসেন। বাবার আর মেয়ের দু'জনেরই চোখ তখন ছলছল করে ওঠে। তারপর আবার যে-কে-সেই। তারপর ভৈরববাবু আবার অফিসের কাজের মধ্যে ঢুকে সব ভুলে যান। আবার জীবন তাঁর বাঁধা গতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

কিন্তু একদিন ভৈরববাবুর রিটায়ার করবার দিন এল। ভৈরববাবু মেয়েকে লিখলেন—মা প্রভা, আমি তোমার ওখানেই যাইতেছি। এখানকার পাট উঠিল। সংসারের অনেক ছোটখাটো এবং তক্তপোষ ইত্যাদি ভারি ভারি জিনিসগুলি এখানকার লোকদের দিয়া দিলাম। বাকি অপরিহার্য জিনিসগুলি লইয়া আগামী সোমবার রওনা হইতেছি—

ফেয়ারওয়েল দিলে অফিসের স্টাফরা। একটা মানপত্রও দিলে হিন্দিতে। তিনি যে কত উদার ছিলেন, কত মহৎ ছিলেন, কত কর্মঠ পুরুষ ছিলেন, তারই বর্ণনা লেখা ছিল তাতে। আর দিলে একটা রূপো-বাঁধানো লাঠি।

লাঠিটার দিকে চেয়ে দেখলেন ভৈরববাবু। সেটা হাতে নিয়ে নাড়তে চাড়তে ভাবলেন—সত্যিই তো, এরা সবাই বুঝতে পেরেছে যে তিনি বুড়ো হয়েছেন। বুড়ো হলে তো সকলেরই লাঠির দরকার হয়। তাঁরও তো লাঠির দরকার হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক জিনিসই দিয়েছে তারা।

মালপত্র বাক্স-বিছানা, বলতে গেলে পুরো সংসারটা উঠিয়ে নিয়েই এলেন তিনি। সারা জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো মধ্যপ্রদেশ তাঁকে ছেড়ে আসতে হলো।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছতেই মেয়ে এসে হাজির।

বললে—রাস্তায় কোনও কষ্ট হয়নি তো বাবা তোমার?

ট্রেন থেকে এক লাফে নামলেন ভৈরববাবু। বললেন—কষ্ট হতে যাবে কেন? তা সে কথা যাক গে, তুই কেন আবার ইস্কুল কামাই করে স্টেশনে আসতে গেলি? তোর ঠিকানা তো আমার জানাই ছিল, আমি একটা ট্যাক্‌সি ভাড়া করে তোর ঠিকানায় গিয়ে হাজির হতুম—দেখতিস কিচ্ছু গোলমাল হতো না—

প্রভা বললে—ট্যাক্‌সি তো নেই আজকে বাবা, আজকে যে ট্যাক্‌সি ধর্মঘট—তুমি বিপদে পড়বে বলেই তো আমি এলুম—

—কেন? ট্যাক্‌সি-ধর্মঘট কেন?

প্রভা বললে—তা জানি না, আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনলুম আজ ট্যাক্‌সি নাকি চলবে না।

ভৈরববাবু বললেন—তা ধর্মঘটের কারণটা কী? বলা নেই কওয়া নেই ধর্মঘট করলেই হলো? এই ট্রেনের এত লোক মাল-পত্তোর নিয়ে কী করে বাড়ি যাবে?

প্রভা বললে—ও কলকাতায় হয়ই, ও নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি—

—তাহলে মালপত্র নিয়ে তোর বাসায় যাবো কী করে?

প্রভা বললে—তাই তো ভাবছি। শেষ পর্যন্ত যদি কিছু না পাওয়া যায় তখন একটা রিক্‌শা নিতে হবে—

—রিক্‌শা? রিক্‌শাতে এত বাক্স-প্যাঁট্‌রা ধরবে?

প্রভা বললে—একটা রিক্‌শায় না যায়, দু'টো রিক্‌শা নিতে হবে!

তা রিক্‌শা পাওয়াই কি সোজা! চারদিকে তখন হাজার-হাজার লোক ছুটোছুটি আরম্ভ করেছে। হাঁক-ডাক হৈ-চৈ।

কিন্তু প্রভা বেশ সেয়ানা হয়েছে। ভৈরববাবু দেখে অবাক হয়ে গেলেন সেই ভিড়ের মধ্যেই প্রভা কুলিদের নিয়ে বেশ এগিয়ে চলেছে। সবকিছু সামলে নিচ্ছে।

তারপর প্লাটফরমের এক জায়গায় এসে বললে—বাবা, তুমি এখানে দাঁড়াও দিকিনি, আমি একটা রিক্‌শার ব্যবস্থা করে আসি—

ভৈরববাবুকে অবাক করে দিলে প্রভা! প্রায় আধঘণ্টা কাটবার পর কোথা থেকে হুড়মুড় করে আবার এসে হাজির। বললে—চলো বাবা, চলো,—

—গাড়ি পেয়েছিস?

যেন গাড়ি পাওয়া নয়, আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া।

প্রভা সামনের দিকে চলতে চলতে বললে—গাড়ি পাইনি। রিক্‌শা পেয়েছি একটা, তাইতেই যেতে হবে।

তারপর মোট-ঘাট নিয়ে পাঁচঘণ্টা লাগলো নস্কর-বাগানে আসতে। পিঠে-পেটে ব্যথা হয়ে গেল একেবারে। রিক্‌শা থেকে নেমে শিরদাঁড়া সোজা করতেই পাঁচ মিনিট লাগলো। প্রভা গুনে গুনে সতেরোটা টাকা দিলে।

—কত টাকা দিলি?

—সতেরো টাকা।

ভৈরববাবু লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—বলিস কী রে? সতেরো টাকা?

প্রভা বললে—রিক্‌শা পেয়েছি এই যথেষ্ট। কলকাতার যা হাল, তুমি তা জানো না। কুড়ি টাকা পঁচিশ টাকা চাইছিল সবাই। তারপরে এত মাল-পত্তোর। এ লোকটা রাজী না হলে শেষে সারাদিন স্টেশনেই যে পড়ে থাকতে হতো—

মাল-পত্র তোলা হবার পর ভৈরববাবু যেন একটু চাঙ্গা হলেন।

—হ্যাঁ রে, তুই কত মাইনে পাস?

প্রভা বললে—দু'শো কুড়ি টাকা। আর তার সঙ্গে ডিয়ারনেস

এ্যালাউয়েন্স আছে—

—তাতে তোর চলে কী করে ? বাড়ি-ভাড়া তো চল্লিশ টাকা বললি। তাহলে থাকলো কত ?

প্রভা বললে—শুধু কি মাইনেতে চলে নাকি ? টিউশনিও করি যে ! তা এ-সব কথা এখন থাক, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও। কাল সেই বিকেল বেলা ট্রেনে উঠেছ। তারপর সারারাত তোমার ঝাঁকুনি গেছে। আমি তোমার ভাত চড়িয়ে দিই—

তা প্রথম দিনেই আলাপ হয়ে গিয়েছিল করুণাবাবুর সঙ্গে। করুণাকান্ত সরকার। নিজে থেকেই এসে আলাপ করলেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট লোক। বড়বাজারে দোকান। দোকান করে বেশ দু' পয়সা করেছেন। কলকাতায় বাড়ি করেছেন দু'-তিনখানা। সব আলাদা আলাদা ছেলের নামে। ছেলেরা সকাল বেলাই দোকানে চলে যায়। এখন করুণাবাবুর বয়েস হয়েছে, তাই সব দিন আর নিজে দোকানে যান না।

খানিকক্ষণ রোয়াকে বসে গল্প করার পর করুণাবাবু বললেন—যাই, আপনার সঙ্গে আলাপ হলো ভালো হলো, এখন আবার গিয়ে আহ্নিক করতে হবে—

করুণাবাবু চলে যেতেই ভৈরববাবু ভেতরে এলেন। প্রভা তখন রান্নাঘরের ভেতরে উনুনে আগুন দিয়ে রান্নার জোগাড় করছে।

কাছে গিয়ে ভৈরববাবু বললেন—ও রে, তোর বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। ভদ্রলোক বেশ ভালো লোক তো। বেশ ভালো বাড়িওয়ালা পেয়েছিস—

—কে ? করুণাবাবু ?

ভৈরববাবু বললেন—হ্যাঁ, নিজে থেকে এসে আলাপ করে গেলেন। আবার জপ-তপ-আহ্নিক করেন। বললেন—পরে আবার আসবেন—

প্রভা বললে—ও-সব কথা পরে শুনবো, তুমি আগে চান করে নাও বাবা ! তোমার জন্যে চৌবাচ্চায় জল রেখে দিয়েছি—

সে দিনটা কাটলো। পরের দিন আরো ভালো লাগলো বাসাটা।

ছোট বাড়ি হলে কী হবে, বন্দোবস্ত বেশ ভালো। রাস্তার ওপরেও নয়, আবার একেবারে ভেতরেও নয়। হাওয়া আসে, রোদও আসে কোনও রকমে একটু। তারই মধ্যে আবার একটা ঢাকা বারান্দাও আছে। সেখানে একটা চৌকি পেতে দিব্যি শুতেও পারো। আর তার পাশেই এক ফালি উঠোন। সেখানে দাঁড়ালে ফাঁকা একচিলতে আকাশও দেখা যায়। তারই এক পাশে কল-চৌবাচ্চা পায়খানা। দিব্যি গোছানো বাড়ি। প্রভাও বেশ গোছালো মেয়ে। বেশ গুছিয়ে সংসার করতে শিখেছে।

বেশিক্ষণ বাড়ির ভেতরে থাকা যায় না। বাড়ি থেকে বেরিয়েই একটু ঘোরাঘুরি করবার মত জায়গা থাকলে ভালো হতো। কলকাতার মতন সহরে তেমন আশাও করেননি ভৈরববাবু। তিনি চটিটা পায়ে দিয়ে বেরোতে যাচ্ছিলেন।

প্রভা জিজ্ঞেস করলে—কোথাও বেরোচ্ছ নাকি বাবা?

ভৈরববাবু বললেন—কাল থেকে বাড়ির মধ্যে রয়েছি, পায়ে বাত ধরে যাবে দেখছি। আমি যে আবার না হেঁটে থাকতে পারিনে রে—

—তাহলে এক কাজ করো না বাবা, তুমি ওই দিকেই তো যাচ্ছো, আমার জন্যে তিন ছটাক হলুদ আর আধ পোয়া নুন নিয়ে এসো তো। এই নাও পয়সা।

বলে মেয়ে পয়সা বার করে দিলে। বাবার হাতে পয়সা দিয়ে বললে—এই নস্কর-বাগান লেন যেখানে ঘুরে বাঁদিকে গেছে ওইখানে একটা দোকান আছে, ওই দোকান থেকে নেবে—

ভৈরববাবু চটিটা পায়ে গলিয়ে রাস্তায় বেরোলেন, চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে বেশ ভালো লাগলো। আশেপাশে একতলা দোতলা তিন-তলা সব বাড়ি। বাড়িগুলোর চেহারা দেখে খুব ভালো লাগলো। সকলের অবস্থা ভালো বলেই যেন মনে হলো।

যেতে যেতে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাড়িটার দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা অক্ষরে যেন কী সব লেখা রয়েছে আলকাতরা দিয়ে। দেখে বোঝা যায় নতুন বাড়ি করেছেন ভদ্রলোক। নতুন রং দিয়েছেন দেয়ালে।

চশমাটা ভালো করে বাগিয়ে নিয়ে ভৈরববাবু সামনে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চীনের পথ আমাদের পথ'—

ব্যাপারটা কী বুঝতে পারলেন না। বাড়ির সদর-দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। ভেতর থেকে কে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন সামনের দিকে। তারপর ভৈরববাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কাকে চান?

ভৈরববাবু বললেন—না, আমি কাউকে চাইছি না—এ আপনার বাড়ি বুঝি?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, কেন?

ভৈরববাবু বললেন—তা ওই কথাগুলো কী লিখে দিয়েছেন তাই দেখছিলাম—

—কোন্ কথাগুলো? ওই দেয়ালের ওপর?

—হ্যাঁ, ওর মানেটা কী তাই ভাবছিলাম। চীনের চেয়ারম্যান মানে কী বলুন তো? কে চীনের চেয়ারম্যান?

ভদ্রলোক ভৈরববাবুর দিকে চেয়ে আগাপাছতলা ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কোথায় থাকেন? কোন্ পাড়ায়?

ভৈরববাবু যেন কথা বলতে পেয়ে বেঁচে গেলেন।

বললেন—এই তো এই গলিটার ওই দিকে। প্রভাকে চেনেন?

—প্রভা? প্রভা কে? কোন বাড়িটায় থাকে? কত নম্বর?

ভৈরববাবু বললেন—এই রাস্তারই বারো নম্বরে, করুণাকান্ত সরকারকে চেনেন? বড়বাজারে স্টেশনারি দোকান আছে তাঁর। ভারী ধর্মভীরু লোক। রোজ আহ্নিক-টাহ্নিক করেন। তাঁরই

বাড়িতে আমার মেয়ে ভাড়া থাকে। তীর্থময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের টিচার—

এতগুলো কথা কিন্তু শুনতে চাননি দেবসুন্দরবাবু। কলকাতা সহরে কে আর কার কথা শোনে! কে আর কার খবর রাখে! ভৈরববাবু গড়-গড় করে অনেক কথা একসঙ্গে বলে গেলেন। তারপর বললেন—আমি মশাই কাল এসেছি বায়পুর থেকে। রায়পুর চেনেন তো? মধ্যপ্রদেশের মস্ত বড় সহর। এখনও কাউকেই চিনি না এখানকার—

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, রায়পুবের নাম শুনেছি—

—নাম শুনেছেন তো? শুনবেন বৈকি! বায়পুর তো আর ছোট সহর নয়। ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে আমি ছিলাম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শুধু নামেই। আসলে যাকে বলে বড়বাবু। মানে যাকে বলে হেড-ক্লার্ক আব কি। চারশো টাকা মাইনে পেতুম। আর পঁয়তাল্লিশ টাকা ডিয়ারনেস এলাউয়েন্স—তবে কি জানেন, সস্তা-গণ্ডার দেশ তো, ওই মাইনেতেই চালিয়ে নিতুম এক বকম কবে। আমি আবাব এদিকে স্বাবলম্বী মানুষ। সব কাজ বরাবর নিজের হাতে কর' অভ্যেস আমার। ঘবঝাঁট দেওয়া থেকে শুরু কবে রান্না করা পর্যন্ত কোনও কাজ মশাই আমার আটকায় না। একদিন চেয়ারম্যান মহাজন সাহেব বাড়িতে এসেছেন। আমার তখন পবনে গামছা, হাতে ঝাঁটা, ড্রেন সাফ করছিলুম। তিনি তো দেখে অবাক। আমাব অত লজ্জাসরমের বালাই নেই; লজ্জা করবো কেন, বলুন? Selt heip is the best help. কী বলেন? তা মহাজন সাহেব, আমাকে বললেন···

ভদ্রলোক এক মনে শুনতে লাগলেন ভৈরববাবুর কথাগুলো। আর বার বার ভৈরববাবুর আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। এ ধরনের মানুষ যেন আগে তিনি কখনও দেখেননি। গড়-গড় কবে নিজের ঘরের কথা এমন করে অকপটে কেউ যে বলতে পারে তা তাঁর জানা ছিল না।

ভদ্রলোক বললেন—বাইরে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ কথা বলবেন, আসুন, ভেতরে আসুন না—

—ভেতরে যাবো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে আসুন।

—কিন্তু আপনার কাজকর্মের কোনও ক্ষতি করে ফেলবো না তো ? আমার আবার কথা বলতে পেলে কিছু হুঁশ থাকে না মশাই—।

বলে ভদ্রলোকের পেছন-পেছন ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। চটিটা বাইরে রেখে ঢুকছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন—না না, জুতো বাইরে রাখতে হবে না, চুরি হয়ে যাবে, এ পাড়ার লোকজন ভালো নয়—

কিন্তু ভৈরববাবুর কেমন সংকোচ হতে লাগলো। এত ভালো মেঝে, এত সাজানো ঘর, তার ভেতরে ময়লা জুতো নিয়ে যাবেন!

—দেখুন, এ আমার সস্তা দামের চটি, রায়পুরে কিনেছিলাম, সাড়ে সাত টাকা দাম নিয়েছিল। রায়পুব সোনার দেশ মশাই, তবে সেখানকার রাস্তাঘাট এ-রকম নয়। সে একেবারে লাল মাটি চারদিকে। আর যা গবম পড়ে সেখানে গ্রীষ্মকালে, সে কী বলবো! লাস্ট-ইয়ারে গরম পড়েছিল একশো কুড়ি ডিগ্রি। রাত্তিরবেলা তো আমরা সবাই ছাদেই শুতুম। আমি, প্রভা, প্রভার মা, সব ছাদের ওপর গড়া-গড়া খাটিয়া পেতে শুতুম—

—আপনি কাঠের চেয়ারটায় বসলেন কেন? এই গদীওয়ালা সোফাতে বসুন না।

ভৈরববাবু তখন কথা বলতে এত ব্যস্ত যে কোথায় বসছেন সেদিকে খেয়াল ছিল না। এতক্ষণে চেয়ে দেখলেন। ঘরে বেশ বাহারে সোফা-কৌচ পাতা রয়েছে। মাঝখানে চৌকো একটা কার্পেট। চেয়ারম্যান মহাজন সাহেবের বাড়িতে ঠিক এই রকম সোফা-কৌচ ছিল।

কৌচে গিয়ে বসতেই একেবারে সেটার মধ্যে ডুবে গেলেন।

বললেন—খুব আরাম হলো তো এটাতে বসে। ভারি আরাম হলো। সাহেব ব্যাটাবা মশাই আরাম কবতে জানতো। আমাদের বাঙালীদের তেমন পয়সাও নেই, তেমন আরাম করতেও জানিনে। তা হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—

বলে থেমে গেলেন। তারপর দেবসুন্দরবাবুকেই জিজ্ঞেস করলেন—কী কথা বলছিলুম বলুন তো?

দেবসুন্দরবাবু মনে করিয়ে দিলেন।

বললেন—ওই চীনের কথা বলছিলেন। চীনের চেয়ারম্যান—

হ্যাঁ, এতক্ষণে কথাটা মনে পড়ে গেল ভৈরববাবুর। বললেন—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা আপনি নতুন বাড়ি করে ও-সব কথা লিখে রেখেছেন কেন? চীনের চেয়ারম্যান কে? আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান তো ছিলেন মহাজন সাহেব, তাঁকে দেখেছি আমি। চীনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?

দেবসুন্দরবাবু এবার খুব জোরে হেসে উঠলেন। একেবারে হো-হো শব্দ করে।

বললেন—আপনি দেখছি একেবারে সেকেলে লোক, কলকাতায় নতুন এসেছেন তো, কিছুই খবর-টবর রাখেন না দেখছি—আপনার আর আমার বয়েস তো একই বোধ হয়। আমিও সম্প্রতি চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। কিন্তু আপনি বাইরে থাকতেন বলেই কিছু খবর রাখেন না আর কি! আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করবেন, সে এসব জানে!

বলে আবার হাসতে লাগলেন।

ভৈরববাবু তবু কিছু বুঝতে পারলেন না।

বললেন—তার মানে?

ভদ্রলোক বললেন—আপনাব মেয়ে কলকাতায় থাকে কিনা, তাই সে সব জানে। তাকে জিজ্ঞেস করবেন। ও লেখা আমি লিখিনি, বাইরেব ছোকরারা লিখে দিয়ে গেছে—

—বাইরের ছোকরারা মানে? আপনাব বাড়ির দেয়ালে তারা লিখতে যাবে কেন? তাদের কীসের দায়?

হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ডাকলে—বাবা—

প্রভার গলা। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভৈরববাবু দেখলেন প্রভা তাঁর দিকে চেয়ে তাঁকে ডাকছে।

মেয়েকে দেখেই একেবারে যেন মর্ত্যে নেমে এলেন ভৈরববাবু। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—ওই আমার মেয়ে

ডাকতে এসেছে—

রাস্তা থেকেই মেয়ে বলে উঠলো—বারে, তুমি এখানে বসে বসে গল্প করছো, আর আমি ওদিকে হলুদ আর নুনের জন্যে বসে আছি—

—এই যাই। এই আমার মেয়ে। আমার মেয়েকে চেনেন তো? এই নস্কর-বাগান লেনের বারো নম্বর বাড়িতে থাকে। করুণাকান্তবাবুর বাড়িতে।

ভদ্রলোকও দেখলেন প্রভাকে। চিনতে পারলেন মুখখানা। কিন্তু কিছু মন্তব্য করলেন না।

ভৈরববাবু বললেন—আমি মশাই আবার আর একদিন বরং আসবো, আলাপ হলো ভালো হলো—

বলে রাস্তায় এসে নামলেন। প্রভা অনেকক্ষণ ধরে বাড়িতে বাবার জন্য অপেক্ষা করেছে। রাস্তায় খুঁজেছে। মুদির দোকানেও খুঁজেছে, কোথাও পায়নি বাবাকে। শেষকালে যখন হতাশ হয়ে বাড়ির দিকে চলে আসছিল, তখনই হঠাৎ একটা বাড়িব বাইরের ঘরের ভেতরে বাবাকে দেখতে পেলে।

প্রভা বললে—তোমাকে তিন ছটাক হলুদ আব আধ পোয়া নুন কিনতে দিয়েছিলুম, তাই কিনতেই তোমার দিন কাবার হয়ে গেল। তা কিনেছো?

ভৈরববাবু অপরাধীর মতো চাইলেন মেয়েব দিকে।

বললেন—ওই যাঃ, গল্প করতে কবতে একেবাবে ভুলে গেছি মা। আমি তো গল্প করতুম না। কিন্তু দেখলুম ভদ্রলোক নতুন বাড়ি করেছেন অত পয়সা খবচ করে আর দেয়ালে কী সব লিখে বেখে দিয়েছেন, পড়তে পারছিলুম না, তাই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করছিলুম ও লেখাগুলোর মানে কী? তা ভদ্রলোক কী বললেন জানিস?

প্রভা জিজ্ঞেস করলে—কী বললেন?

—বললেন আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করবেন। সে জানে। সত্যি বল তো মা ও-কথাগুলোর মানে কী? আমি তো ভেবেই অবাক, লোকে বাড়ির সামনে এরকম নানা কথা লিখে রাখে! তুই তো

জানিস আমাদের চেয়ারম্যান মহাজন সাহেব বাড়ি করেছিলেন? বাড়ির সামনের দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখেছিলেন—'গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্'। তারপর আমাদের সেক্রেটারি সাহেব মিউনিসিপ্যালিটির জমি নিয়ে নতুন বাড়ি করলেন, বাড়ির সামনের দেয়ালে শ্বেত-পাথরের ওপর লিখে দিলেন—'সর্বতো ভদ্রঃ'। ওসব তো বুঝি। অনেকে আবার ইংরিজীতেও কত কী লিখে দেয়। কিন্তু এরকম আলকাতরা দিয়ে ওসব লিখতে গেলেন কেন বল্ তো? ওর মানে কী? তুই লেখাটা দেখেছিস? ওই ছাখ, চেয়ে ছাখ। লেখাটা পড় তুই—

প্রভা লেখাটার দিকে চেয়েও দেখলে না। বললে—ওসব দেখার সময় নেই আমার, তুমি শিগ্‌গির শিগ্‌গির চলো—ওদিকে আমার রান্না আটকে আছে—

ভৈরববাবু বুঝলেন অপরাধটা তাঁরই। অপরাধীর মত গলিটা পেরিয়ে মেয়ের সঙ্গে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে হঠাৎ কী যেন মনে পড়লো। বললেন—ওই যাঃ--

প্রভা বুঝতে পারলে না কিছু। বাবার যেন কোনও কাজ করবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেটা করতে ভুলে গেছে।

জিজ্ঞেস করলে—কী হলো?

ভৈরববাবু বললেন—এমন আমার ভুলো মন ছাখ, এতক্ষণ ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে বসে কথা বলে এলুম, অথচ ভদ্রলোকের নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হলো না—যাই, এক্ষুনি জিজ্ঞেস করে আসি—

বলে মেয়েকে ফেলে একলাই আবার উল্টো দিকে হন্ হন্ করে চলেন। একেবারে দরজার সামনে গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেছেন।

ভৈরববাবু দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলেন—ও মশাই শুনছেন? শুনুন—

কেউ উত্তর দিলে না।

ভৈরববাবু সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন।

—ও মশাই, শুনছেন ? শুনুন—

কিন্তু দেবসুন্দরবাবু ততক্ষণে একেবারে অন্দর মহলে ঢুকে গৃহিণীর কাছে চলে গিয়েছেন।

—বুঝলে ? ওগো ? কোথায় গেলে তুমি ? ওগো ?

ডাকতে ডাকতে একেবারে আরো ভেতরে চলে গেলেন। জীবনে অনেক পয়সা জমিয়েছিলেন ভদ্রলোক। এককালে অনেক কষ্ট করেছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীও কষ্ট করেছেন অনেক। প্রথম জীবনে টিনের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তখন গৃহিণীকে নিজের হাতে রান্না-বান্না করতে হয়েছে, বাসন মাজতে হয়েছে। তার ওপর বছর বছর সন্তান প্রসব করেছেন। তারপর এমন একটা চাকরিতে গেলেন যেখানে একেবারে ঘুঁষের রাজ্য। তারপরে বড় যুদ্ধটা বাধলো। সেই যুদ্ধের সময় ঘুঁষের আর গোনা-গুন্তি ছিল না। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে আসতেন কোঁচড়ে ভর্তি করে। যেদিন বেশি রোজগার হতো সেদিন আর বাসে-ট্রামে আসতে পারতেন না। ভয় করতো। একেবারে মোটা লোকসান দিয়ে ট্যাক্সি চড়েই বাড়ি আসতেন।

তখন থেকেই গৃহিণীর সুখ সুরু হলো। গতরে মোটা হলেন। ঝি-চাকরে ঘর ভরে গেল। পরনে ভালো শাড়ি দামী গয়না উঠলো। লক্ষ্মী উপচে পড়তে লাগলো সংসারে।

সেই গৃহিণী তখন বাঁধুনীকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন রাত্রে কী কী রান্না হবে। বাবুর জন্যে লুচি আর তার সঙ্গে আলু ভাজা। বাবু গরম আলু ভাজা না হলে রাগ করেন, তা মনে আছে তো ঠাকুর ? আর বড়দাদাবাবুর জন্যে মাংসতে ঝাল কম দেবে। তোমার ঝালের হাত একটু কমাও বাপু। অত ঝাল খেলে মানুষের অসুখ করবে যে !

দেবসুন্দরবাবু একেবারে হাঁক পড়তে পড়তে স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন।

—ওগো শুনছো ?

গৃহিণী বললে—কী ?

—আরে ওই বারো নম্বরের বাড়িতে যে-মেয়েটা থাকে জানো তো ?

গৃহিণী বুঝতে পারলে না। বললে—কে বারো নম্বরে থাকে ? আমি বারো নম্বর বললে চিনবো কী করে ? আমি কি রাস্তায় বেরোই যে সব বাড়ির নম্বর দেখে দেখে চিনে রাখবো ?

রঁাধুনীও আর তখন দাঁড়ায়নি। সে কাজের হিসেব নিয়ে আবার রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন—আরে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যে-মেয়েটা ইস্কুলে যায়। বোধহয় মেয়ে-ইস্কুলে টিচার-ফিচার হবে।

—হ্যাঁ, তা সে কী করেছে ?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—না, তার কথা বলছি না. তার বাবা এখন রিটায়ার করে কলকাতায় মেয়ের কাছে এসেছে। রায়পুরে থাকতো ওরা।

—কী বলছিল ?

ভদ্রলোক বললেন—না, তাই তোমার কাছে বলতে এলুম। অমন বাপের এমন মেয়ে হলো কেন তাই ভাবছি। বাপকে দেখে তো বেশ ভদ্রলোক বলে মনে হলো। বেশ রগুড়ে লোক। কিন্তু মেয়েটা অমন হলো কেন ?

—মেয়েটা কেমন ?

—আরে সেই কথাই তো বলছি তোমাকে। দেখনি মেয়েটা যার-তার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। যতসব বড় বড় জুলফি-ওয়ালা বখাটে ছেলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়ায় ? আমি তাই করুণা-বাবুকেও তো বলছিলুম—আপনি মশাই আর ভাড়াটে পেলেন না ? তা করুণাবাবু বললেন—তখন কি আমি জানি মশাই যে, মেয়েটা ওই রকম। বললে তীর্থময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে মাস্টারি করে, তাই আমি ভাবলুম একটা মেয়ে থাকবে, রান্না-বান্না করে খাবে থাকবে,

এ তো ভালোই। ছেলে-ছোকরা ভাড়াটে হলে বরং ভয় ছিল—

কথা শেষ হবার আগেই কানে এল সদর দরজায় কে যেন ঘা দিচ্ছে।

তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এসে দরজা খুলতেই দেখলেন—সেই বারো নম্বরের মেয়েটার বাবা।

বললেন—কী হলো? আবার ফিরলেন যে?

ভৈরববাবু বললেন—একটা ভুল হয়ে গেছে মশাই, দেখুন কী ভুলো মন আমার! আপনার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করলুম, আপনার নামটাই জিজ্ঞেস করা হলো না—আপনি আমার নাম জানেন না, আমিও আপনার নাম জানলুম না। অথচ দু'জনে এতক্ষণ কথা বললুম। আমার নাম হলো গিয়ে শ্রীভৈরব চক্রবর্তী—

দেবসুন্দরবাবু হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন—আমার নাম হলো দেবসুন্দর পাল। আপনি সময় পেলেই আসবেন, গল্প-টল্প করা যাবে।

ভৈরববাবু বললেন—আমাকে আর তা বলতে হবে না পাল-মশাই—। দেখবেন কালই এসে হয়ত হাজির হবো—

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আর কলকাতার যা হালচাল চলেছে তাতে তো এখন আর বাড়ির বাইরে বেরোবার উপায় নেই—

ভৈরববাবু ফিরতে গিয়েও তবু ফিরতে পারলেন না।

বললেন—কেন বলুন তো?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—মুদির দোকানে গিয়েছিলেন আপনি?

ভৈরববাবু বললেন—না, মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছিলুম, তা হঠাৎ আপনার নামটা জিজ্ঞেস করতে এলুম। মেয়েকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি—

দেবসুন্দরবাবু বললেন—তাহলে আর দাঁড়াবেন না, পরে কথা হবে, আসবেন কিন্তু ঠিক—

বলে ভৈরববাবু চলে যেতেই আবার সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

রাত্রে ভৈরববাবুর ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। মনে হলো যেন কোথাও একটা বিকট শব্দ হলো। এই ক'দিনেই বেশ পাড়ার কয়েকজনের সঙ্গে ভৈরববাবুর পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। ক'দিন থেকেই ভাবছিলেন এসব কী হচ্ছে কলকাতা সহরে!

দেবসুন্দরবাবুই প্রথম দিনে বলেছিলেন—কলকাতায় হালচাল বড় খারাপ চলেছে মশাই, অথচ সারা জীবন তো এই কলকাতাতেই কাটিয়েছি, আমরা দরকার হলে রাত বারোটা-একটা-দুটোর সময় বাড়ি ফিরেছি, কিছু হয়নি। এখন সন্ধ্যেবেলাই বেরোতে ভয় করে—

বারান্দাটায় একটা তক্তপোষের ওপর বিছানাটা পেতে ভৈরববাবু শুয়ে থাকেন। বুড়ো বয়েসের পাতলা ঘুম। প্রথম রাতটায় বেশ গাঢ় হয়েছিল ঘুমটা। আগের রাতটা ট্রেনে কেটেছে। তারপর হাওড়া স্টেশন থেকে সারা রাস্তা রিক্‌শা করে আসতেই গায়ের গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। তারপরে কোথা দিয়ে রাত কেটে গিয়েছিল তা মালুম হয়নি।

কিন্তু পরের রাত্রে আর তেমন ঘুম হলো না।

সকাল বেলা উঠে মেয়েকে বললেন—এখানে খুব মশা মা, রায়পুরে তো এ রকম মশা ছিল না রে—

প্রভা বললে—তোমাকে তো মশারি টাঙিয়ে দিয়েছিলুম বাবা। তবু মশা কামড়েছে?

ভৈরববাবু বললেন—কখন কোন্ ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে দেখতে পাইনি, সারা রাত কামড়েছে—

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, এখানকার কলকাতার

মিউনিসিপ্যালিটি নেই ?

প্রভা বললে—মিউনিসিপ্যালিটি থাকবে না কেন ?

—তা তারা মশা মারবার জন্যে তেল ছড়ায় না কেন ? আমরা তো রায়পুরে কত তেল ছড়িয়ে দিয়েছি নর্দমায় নর্দমায়—

প্রভা বললে—রায়পুরের সঙ্গে কলকাতার তুলনা ?

—তা এদের চেয়ারম্যান নেই ? চেয়ারম্যান কিছু দেখে না বুঝি ? আমাদের মহাজন সাহেব তো নিজে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সব দেখতো।

প্রভা বললে—অত ঘোরবার সময় এখানকার চেয়ারম্যানের নেই—অত ঘুরলে তো কোনও লাভ হবে না তার, তার চেয়ে মীটিং করলে বরং খবরের কাগজে তার নাম ছাপা হবে—

—তা খবরের কাগজে নাম ছাপিয়ে লাভ কী হবে ?

প্রভা বললে—সে সব তুমি বুঝবে না বাবা, অত বোঝাবারও সময় নেই আমার, আমি চলি—

বলে প্রভা ইস্কুলে চলে গেল।

বেশ বড় বড় দাগ হয়ে গিয়েছিল ভৈরববাবুর সারা শরীরে। তা হোক, কলকাতা সহরে থাকতে হলে এ সব সহ্য করতেই হবে। উপায় তো নেই।

রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হলেই ভৈরববাবু জিজ্ঞেস করেন—আপনি এই নস্কর-বাগান লেনেই থাকেন বুঝি ?

কেউ বলে—না, আমি থাকি বাদুড় বাগানে—

ভৈরববাবু চিনতে পারেন না। বলেন—বাদুড় বাগান কোথায় ? আমি মশাই কলকাতায় নতুন লোক, সব জায়গা চিনিনে—বরাবর রায়পুরে থেকে এসেছি কি না। রায়পুর চেনেন তো ?

—রায়পুর ? কোন্ রায়পুর ?

ভৈরববাবুর চিরকালের অভ্যেস মানুষকে ডেকে ডেকে তার সঙ্গে আলাপ করা। তেমন গল্পবাজ লোক হলে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটু কথা বলতে পেলে ভৈরববাবুও যেন বেঁচে যান। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক দূর এগিয়ে যান। তারপরে বলেন—

চলুন না, পার্কের ভেতরে গিয়ে একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে বসি।

চেনা নেই শোনা নেই, বসে বসে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গেই অনেক গল্প করেন। কিন্তু বেশিক্ষণ গল্প করার সময় কারো নেই কলকাতায়। একটু সন্ধ্যে হলেই সবাই উঠে পড়ে। বলে—সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বাড়ি যাই মশাই, দিনকাল বড় খারাপ—

ভৈরববাবু সকলকেই জিজ্ঞেস করেন—আগে কি মশাই এখানকার দিনকাল ভালো ছিল বুঝি ?

ভদ্রলোকেরা বলে—খুব ভালো ছিল মশাই। খুব ভালো ছিল। তখন এই ধর্মতলার মোড়ে একটা দোকান ছিল, সেখানে একটা সার্ট কিনেছি পাঁচ সিকে দিয়ে—

ভৈরববাবু বলেন—সে আর কী এমন নতুন কথা বলছেন, লঙ্কাতেও তো শুনতে পাই এক টাকা ভরি সোনা ছিল—আমরা রায়পুরে এক পয়সায় পাঁচ সের বেগুন কিনে দু পয়সা কুলি ভাড়া দিয়ে বাড়িতে বয়ে আনতে হয়েছে। আমার মেয়ে দুশো কুড়ি টাকা মাইনে পায়, আর ডিয়ারনেস এ্যালাউয়েন্স্ কুড়ি টাকা, তাইতে চল্লিশ টাকা বাড়ি ভাড়া দেয়, বাকি দুশো টাকাতেও আমাদের দুটো পেট চলে না। দিনকাল খারাপ সে তো দেখতেই পাচ্ছি—

ভদ্রলোকরা বলে—না, সে কথা বলছি না—বলছি রাস্তায় ঘাটে তখন তো এরকম ছোরা-ছুরি বোমা-পটকা মারামারি চলতো না—। তাই বলছি, সন্ধ্যে বেলা রাস্তায় না-থাকাই ভালো।

বলে ভদ্রলোকরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন।

যে ভদ্রলোকের বাড়ি বাদুড় বাগানে তিনিও বললেন—আসি তাহলে—

ভৈরববাবু কাউকেই ছাড়তে চান না সহজে। বললেন—আপনাদের পাড়ায় কেমন চলছে ? ছোরা-ছুরি বোমা-পটকা মারামারি ?

ভদ্রলোক বললেন—না, আমাদের পাড়াটা মশাই ওদিক থেকে ঠাণ্ডা। গলি-রাস্তার ভেতরে গেলে ও-সব আছে। আপনাদের এই

নস্কর-বাগান লেন কেমন ?

ভৈরববাবু বললেন—না মশাই, আমাদের এ-পাড়ায় তেমন কিছু নেই।

ভদ্রলোক বললেন—নেই নেই বলছেন বটে, কিন্তু কোন্ দিন দেখবেন আপনাদের পাড়াতেও হবে, আমাদের পাড়াতেও হবে। কিছু বলা যায় না আজকাল।

বলে তিনি উঠে পড়লেন। তারপর নমস্কার করে চলে গেলেন।

ভৈরববাবুও উঠলেন। কিন্তু অত বেলাবেলি উঠতে ইচ্ছে করলো না। বাড়িতে এখন প্রভা হয়ত উনুনে আগুন দিয়েছে। এই সময়টা সমস্ত বাড়িটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যায়। করুণাবাবুর বান্নাঘরেও তখন উনুনে আগুন পড়ে। পাড়ার সব বাড়ি থেকেই তখন ধোঁয়া উঠে সমস্ত গলিটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যায়। সন্ধ্যেটা পার্কের ভেতরেই যা একটু ফাঁকা। দেখলেন গল্প করবার মত কোনও লোক নেই ভেতবে। দূবে লাল-সাদা আলো জ্বলছে দোকানের সাইনবোর্ডগুলোতে। পার্কের বাইরেই ট্রাম আব বাসের রাস্তা। ট্রামেব চাকার শব্দ কানে আসছে।

নিজেকে যেন কেমন নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো ভৈরববাবুর। রিটায়ার করবার পর থেকেই এই রকম লাগছে। বিশেষ করে কলকাতায় আসার পর থেকেই। তিনি আস্তে আস্তে পার্কের ভেতরের ঘোরানো পিচের রাস্তা ধরে পাক দিতে লাগলেন। দিন-বাত এমনি চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগে নাকি কারো ? প্রভা যে কী বলে তার ঠিক নেই। তাই তো ভোরবেলা যখন প্রভা ইস্কুলে চলে যায় তখন আর কোনও কাজ থাকে না ভৈরববাবুর হাতে। তিনি তখন ঝাঁটাটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে সুরু করেন। শুধু ঘর ঝাঁট দেন না, দেয়ালের ঝুলও ঝাড়েন। তারপর গামছাটা পরে নিয়ে উঠোন পরিষ্কার করতে লেগে যান।

করুণাকান্তবাবু বাইরে থেকে ডাকেন—কই, ভৈরববাবু কোথায় ?

সদর দরজা খুলে ভৈরববাবু ঝাঁটা হাতে নিয়ে হাজির হন।

বলেন—এসেছেন, আসুন, আপনারা সব কাজের মানুষ, তাই আর বিরক্ত করি নে। অথচ কাজ না হলে আমি বাঁচতে পারি নে মশাই, তাই ঝাঁটা নিয়ে উঠোনটা পরিষ্কার করছিলুম—

করুণাবাবু বলেন—ভালোই করেছেন, আমিও আহ্নিক করছিলুম এতক্ষণ।

—খুব ভালো অভ্যেস করেছেন আপনি! আহ্নিক-টাহ্নিক করা ভালো—বুঝলেন, ওতে মন পবিত্র হয়—

করুণাকান্তবাবু বলেন—না করে কী করি বলুন! চারদিকে যা সুরু হয়েছে তাতে মনটাকে ঠিক রাখাই তো দায়। আগের কালে যখন ছেলেরা ছোট ছিল তখন দোকান ছাড়া তো আর কিছু ভাবিনি। কিন্তু এখন একটু পরকালের কথা ভাবতে হয়—

—পরকাল ?

ভৈরববাবু পরকালের কথা এতদিন একবারও ভাবেননি।

বললেন—তা পরকাল তো আমারও ঘনিয়ে আসছে—

—আপনারা ভাবেন কিনা জানি না মশাই, কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে তাতে পরকালের কথা না ভেবেই বা কি করি বলুন। কোনদিন হয়তো বোমার ঘায়ে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াতে হবে।

তারপরে বলেন—যাক, আপনাকে আর গামছা পরে আটকে রাখবো না। আপনি যান, কাজ করুন গে—

ভৈরববাবু বলেন—আমার কথা ছেড়ে দিন, আমার কাজ নেই তাই খই ভাজি! চিরকাল নিজের হাতে কাজ করে এসেছি তো, তাই কাজ ছাড়া দু'দণ্ড থাকতে পারি নে। এই দেখুন না, মেয়ে কেবল আমাকে রাস্তায় বেরোতে বারণ করে। আমি বলি ভালো রে ভালো, গায়ে ক্ষমতা রয়েছে এখনও, আমি কখনও চুপ করে হাত কোলে করে বসে থাকতে পারি? তাই সন্ধ্যে বেলায়

পার্কে গিয়ে ডেকে ডেকে লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি। সেদিন বাদুড় বাগানের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো রাস্তায়। কিন্তু কেউ আর রাস্তায় বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। কেন বলুন তো?

করুণাকান্তবাবু বলেন—চারদিকে বোমা-টোমা তো ফাটছে খুব, সেইজন্যেই—

—তা বোমাগুলো মারছে কারা? কোথায় মারছে? আমি তো দেখতে পাইনে। খবরের কাগজে দেখি একটু একটু, কিন্তু কারণটা মশাই বুঝতে পারি না—

করুণাকান্তবাবু বলেন—কেউই বুঝতে পারে না। ও বোঝবার জিনিস নয়—

ভৈরববাবু বলেন—আমিও তো তাই বলি। আর তা ছাড়া আমাদের বোমা মারবেই বা কেন মশাই? আমরা কার কী ক্ষতি করেছি, বলুন? কেউ তো পাগল নয়—

করুণাকান্তবাবু বলেন—হ্যাঁ, আসলে ও-সব নিজেদের পার্টির মধ্যে ঝগড়া। দলে দলে তো সব ভাগ হয়ে গেছে। হাজারটা পার্টি যে আমাদের দেশে। আপনি আমি কী করবো?

ভৈরববাবু বলেন—তা থাক না, পার্টি থাক না। হাজারটা কেন? লক্ষ লক্ষ পার্টি থাকুক, আমাদের কী? আমরা তো মশাই আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের দরকার কী?

করুণাকান্তবাবু বলেন—দরকার নেই বললে তো শুনবো না। আমরাও তো মশাই ট্যাক্সো দিই, আমাদের ভালো-মন্দ আমরা বুঝে নেব না, আমরা কি দেশের বাইরে?

করুণাকান্তবাবুর কথাটা ভৈরববাবুর ভালো লাগলো। কলেজে পড়বার সময় প্লেটোর কথাগুলো পড়েছিলেন। Plato বলে গেছেন—

The punishment that the wise and good men of a country, who decline to take interest in the affairs of their country must suffer—is to be gladly ruled by the rest, viz, fools and knaves.

পার্কের ভেতরে চলতে চলতে করুণাকান্তবাবুর কথাগুলো তাঁর

মনে পড়ছিল। বাড়িওয়ালা হলে কি হবে, লোকটা ভালো। আজকালকার বাজারে কে আর কার খবর নেয়? তবু তো করুণাকান্তবাবু খবর-টবর নেন তাঁর। ওদিকে আবার সকাল-সন্ধ্যায় আহ্নিক করেন।

পাশ দিয়ে একটা ছেলেমানুষ যাচ্ছিল। বাচ্চা ছেলে। নাতির বয়সী। দেখে মনে হলো ভদ্র-বংশের সন্তান। প্যাণ্ট-সার্ট পরা। গালের ওপর লম্বা জুলফি।

জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কাছে ঘড়ি আছে বাবা? ক'টা বেজেছে একবার বলো তো?

ছেলেটার বোধহয় খুব তাড়া ছিল। কোথায় যাচ্ছিল হন্ হন্ করে। কথাটা শুনেই ভৈরববাবুর দিকে চাইলে ভালো করে।

বললে—ছ'টা দশ—

বলে আবার ভৈরববাবুর মুখের দিকে তাকালো। বলল—আপনি দাদু আর পার্কে থাকবেন না, এবার বাড়ি যান—

ভৈরববাবু অবাক হলেন। বললেন—কেন বাবা?

—আমি ভালো কথাই বলছি, আমার কথা শুনুন।

বলে আর দাঁড়ালো না। হন্ হন্ করে যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকেই চলে গেল। ভৈরববাবুও নিজের পথে চলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আবার ফিরে দাঁড়িয়ে ছোকরাটির দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখতে পেলেন না। কিন্তু তবু দেখতে চেষ্টা করলেন। ছেলেটা ভদ্র-বংশের সন্তান বলেই মনে হলো। রায়পুরের ছেলেরাও প্যাণ্ট-সার্ট পরা সুরু করে দিয়েছে। একবার ভাবলেন ছেলেটাকে আবার ডাকেন। জিজ্ঞেস করেন কোথায় থাকে, কোন পাড়ায়? বাবার নাম কী? দেশ কোথায়? ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর ভাবলেন—না থাক্, দরকার নেই। ডেকে-ডেকে তাঁর আলাপ করবার অভ্যেসটাই খারাপ। প্রভাও বারণ করে দিয়েছে। বলেছে—এ তোমার রায়পুর নয় বাবা, এখানে যেচে-যেচে সকলের

বাড়িতে তুমি যাও কেন ? এখানে কেউ কারো নয়। কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না—

ভৈরববাবু বলেছিলেন—কেন, আমি আবার কার সঙ্গে যেচে-যেচে আলাপ করলুম ?

—কেন, ওই যে দেবসুন্দরবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলে ? ওঁদের সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক ?

ভৈরববাবু বলেছিলেন—বারে, দেবসুন্দরবাবুর সঙ্গে কি আমি যেচে আলাপ করতে গিয়েছিলুম ? উনিই তো আমাকে ডেকে নিজের বৈঠকখানায় বসালেন। আমি তো দেয়ালের লেখাটা পড়ছিলুম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

—তা দেয়ালের লেখা পড়বার তোমার দরকারটা কী ? কার দেয়ালে কী লেখা আছে তা নিয়ে তোমার কীসের মাথাব্যথা ? তোমার বাড়ির দেয়ালে লিখলে আলাদা কথা। তুমি রিটায়ার্ড লোক, সারাজীবন অফিসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাকরি করেছ, এখন বাড়ির মধ্যে বসে থাকলেই পারো।

ভৈরববাবু বলেছিলেন—তাই কি কেউ বসে থাকতে পারে ? আমি কাজের মানুষ, হাত-পা সুস্থ-সবল আছে এখনও, সারা দিন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে পারি ? তাই তো তুই যখন ইস্কুলে যাস, আমি তোর রান্নাঘর উঠোন সব কিছু পরিষ্কার করি, কয়লা ভাঙি। কত কাজ করি। তুই ওই ঝি'টাকে তাড়িয়ে দে মা, আমি তোর এঁটো বাসন নিজেই মেজে দেব। ভারি তো দু'টো থালা আর দু'টো বাটি। ওর জন্যে মাসে-মাসে চোদ্দটা টাকা কেন জলে ফেলে দেওয়া ?

এর পরে আর কথা বলা উচিত মনে করেনি প্রভা, সে তার নিজের কাজে চলে গিয়েছিল।

ভৈরববাবু চলতে চলতে ভাবতে লাগলেন—এই-ই হলো জীবন। এর নামই জীবন-যুদ্ধ। নিজের মেয়ে। সেই এতটুকু বাচ্চা বয়েস থেকে কোলে-পিঠে করে যে-মেয়েকে তিনি মানুষ করেছেন, তারই

আবার এখন এত বুদ্ধি হয়েছে। এখন সে-ই আবার বাবাকে উপদেশ দিতে আসে। যেন বাবা কিছু বোঝে না। যেন বাবার কিছু বুদ্ধি নেই।

প্রভা বলে—জিনিসপত্রের দাম কী-রকম বাড়ছে তা তুমি দেখতে পাও না? তুমি সেই কেবল কবে এক পয়সায় পাঁচ সের বেগুন ছিল, তাই-ই ধরে বসে আছ—লঙ্কায় যদি সোনা সস্তা হয় তো আমাদের কী?

—মানুষ যে বেড়েছে রে—

ভৈরববাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি আবার বলেন—মানুষ যে বেড়েছে রে, তা দাম বাড়বে না? মানুষও বেড়েছে, তাই দামও বেড়েছে—তারপর মানুষের মতি-গতিও যে বদলে গেছে। সেই যুগের মানুষ কি আর আছে?

পার্কের ভেতরে হাঁটতে হাটতে ভৈরববাবুর সেই কথাগুলো বার বার মনে পড়তে লাগলো। ছোট্ট মেয়ে তো, এখনও ভালো-মন্দ বুঝতে শেখেনি। মনে করে দেশের বুঝি হাজারটা সমস্যা। আরে বোকা মেয়ে, আগে হিস্ট্রী পড়। জার্মানি যখন হল্যাণ্ড অ্যাটাক করে বসলো তখন······

হঠাৎ বিকট একটা শব্দ হলো পার্কের মধ্যে।

শব্দটা শুনে ভৈরববাবু চমকে উঠেছেন। কী ফাটলো? কোথায় কী হলো? বোমা নাকি? বাদুড় বাগানের সেই ভদ্রলোক বলছিলেন বটে, ছোরা-ছুরি বোমা-পট্‌কার কথা। সেই সব কাণ্ড নাকি? হঠাৎ কানে এল যেন অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ। কারা যেন দৌড়চ্ছে। দৌড়ে পালাচ্ছে পার্কের গেট দিয়ে। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে চারদিক।

হঠাৎ দেখলেন প্রায় দশ বারোজন লোকের ছায়া-মূর্তি তাঁর দিকেই দৌড়ে আসছে। তাঁর পাশ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে যেতে গিয়ে একজন থম্‌কে তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে গেল।

বললে—দাদু, এখানে দাঁড়াবেন না, চলে যান, পুলিশ আসছে—

ভৈরববাবু বললেন—কেন, কী হয়েছে ?

—ওদিকে বোমা ছোঁড়াছুড়ি চলেছে। শিগ্‌গির চলে যান্—পুলিশে ধরবে—

ভৈরববাবু বললেন—আমি কী করেছি বাবা যে আমাকে পুলিশে ধরবে ? তোমরা যে-যেখানে যাচ্ছ যাও বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, আমি কি দৌড়তে পারি ?

ছোকরা কিন্তু নাছোড়বান্দা ! হঠাৎ ভৈরববাবুর হাতটা ধরে ফেললো। বললে—না, আসুন, আপনাকে আমি বাড়ি পৌঁছিয়ে দিই—

বলে ভৈরববাবুর হাত ধরে টেনে পার্কের গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়লো।

—বাড়ি যেতে পারবেন তো দাদু ?

ভৈরববাবু ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখলেন। একবার মনে হলো বুঝি সেই ছেলেটা। যার কাছে তিনি ঘড়িতে ক'টা বেজেছে জানতে চেয়েছিলেন। ঠিক সেই প্যান্ট-সার্ট পরা চেহারা। লম্বা জুলফি। মাথায় রুক্ষ চুল। কিন্তু আবার মনে হলো আজকালকার সব ছেলেকেই তো এই রকম দেখতে।

তারপর একটু পরে ভৈরববাবু বললেন—নস্কর-বাগান লেনে বারো নম্বর বাড়িতে আমি থাকি। সেটা কোন্ দিকে তুমি জানো ?

আবার ওদিক থেকে আর একটা আওয়াজ হলো। তারপর পর পর কয়েকটা। ধোঁয়ার গন্ধ নাকে আসতে লাগলো তাঁর। ধোঁয়ার ঝাঁজে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

—চলুন চলুন, শিগগির চলুন—

ছেলেটা যত তাড়া দেয় তত যেন ভৈরববাবু থতমত খেয়ে যান। চারদিকে নজর পড়তেই দেখেন আশেপাশের সব বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ হয়ে গেছে! কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। রাস্তার ইলেকট্রিক আলোগুলোও দপ করে এক সময়ে একসঙ্গে নিভে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার।

—প্রভাদি, ও প্রভাদি—

ছেলেটা বারো নম্বর বাড়িটার সামনে এসে ডাকতেই ভেতর থেকে প্রভা দরজা খুলে দিলে। বাবাকে দেখেই প্রভা বলে উঠলো—বাবাকে নিয়ে এলি ?

ভৈরববাবু নিজের মেয়েকে দেখতে পেয়ে যেন বাঁচলেন।

বললেন—ওরে প্রভা, সব অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিকে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না, রাস্তাও চিনতে পারছিলুম না—ভাগ্যিস এই ছেলেটা আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল।

তারপর পাশে চেয়ে দেখলেন ছেলেটা নেই। কখন হঠাৎ চলে গেছে তিনি টের পাননি। ভেতরে ঢুকতেই প্রভা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

ভৈরববাবু বললেন—কী মজা ছ্যাখ মা, তোর নাম করতেই ছেলেটা চিনলে আমাকে, জানিস। আমি তো বাড়ি চিনতে পারছিলুম না, কিন্তু ও আমাকে চেনে মনে হলো। আমাকে হাত ধরে ধরে ঠিক বাড়িতেই তো নিয়ে এসে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল।

প্রভা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আমি বললুম তোমাকে, তুমি কোথাও বেরিও না, তা তুমি তো শুনবে না। তুমি বুড়ো মানুষ, কোথাও বেরোবার দরকার কী তোমার ?

ভৈরববাবু কোনও কথা বললেন না। প্রভা সকাল-সকাল ভাত দিলে। তাই খেয়ে নিয়ে তিনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। যখন মাঝ-রাত তখন দুম-দাম শব্দে আবার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসলেন। ঠিক সেই সন্ধ্যেবেলাকার মত আওয়াজ।

ডাকলেন—প্রভা, ও মা প্রভা—

পাশের ঘরেই প্রভা শুয়ে ছিল। বলে উঠলো—কী বাবা ?

—হ্যাঁ রে, আবার সেই রকম আওয়াজ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছিস ?

প্রভা বললে—ও বোমাব আওয়াজ, ও কিছু না, তুমি ঘুমোও—

ভৈরববাবুর আর কিছু বলার সাহস হলো না। আবার হয়ত

সেই পার্কের মধ্যে ছুরি-ছোরা বোমা-পটকা চলছে। তিনি বিছানায় শুয়ে সেই আওয়াজ শুনতে লাগলেন। সবাই মিলে যেন সমস্ত কিছু গোলমাল করে দিতে চায়। যা ভালো বুঝছে করুক গে। কেউ তো হিস্ট্রী পড়ে না আজকাল। নইলে জার্মানি যেদিন হল্যাণ্ড অ্যাটাক করেছিল, সেদিন……

শেষ পর্যন্ত ভৈরববাবু ঘুমিয়েই পড়লেন। বুড়ো মানুষদের রাত্রে এ-রকম ঘুম একবার ভাঙে, আবার এক সময়ে ঘুম আসেও। ও নিয়ে প্রভার দুশ্চিন্তা ছিল না।

হঠাৎ এক সময়ে প্রভার শোবার ঘরের জানালায় আস্তে একটা টোকা পড়লো। এবার প্রভা বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। দরজাটা গিয়ে খুলে দিতেই দেখলে সমর দাঁড়িয়ে।

বললে—কী রে সমর, এত রাত্তিরে তুই?

সমর তখনও হাঁফাচ্ছে। বললে—প্রভাদি, সব্বোনাশ হয়েছে। গণেশদা মারা গেছে।

—সে কী রে?

প্রভার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো। গণেশ মারা যাওয়া মানে যে কী তা যেন প্রভার চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানে না।

যেটুকু জানা ছিল না, সেটুকুও জানিয়ে দিলে সমর। পুলিশের ওপর চার্জ করতে গিয়েছিল গণেশ, আর তারপরেই সুরু হয় লড়াই। ওদের দলের সঙ্গে এদের দলের লড়াইতে পুলিশ বাধা দিতে আসার পরই জিনিসটা জটিল হয়ে ওঠে। আসলে নস্কর-বাগান লেনে সমররাই দলে ভারী। এ দলাদলি এই এক বছর হলো বেশি করে বেড়েছে। প্রভা যখন প্রথম এ পাড়াতে আসে তখন এসব কিছুই ছিল না। একবার ইলেকশানের সময় ভোট দিতে গিয়েই পরিচয়টা হলো এদের। সেদিন দেয়ালে দেয়ালে লেখা বেরোল—"কেউ ভোট দেবেন না। ভোট সাম্রাজ্যবাদীদের ধাপ্পাবাজি। ভোটে সাম্রাজ্য-বাদীদের হারানো যাবে না।"

কথাটার ওপর কলকাতার কেউই তখন বেশি গুরুত্ব আরোপ করেনি। সকালবেলা ওই গণেশ এসেছিল বাড়িতে। বলেছিল—দিদি, দয়া করে আপনি ভোট দেবেন না—

—কেন ভাই? প্রভা জিজ্ঞেস করেছিল।

গণেশের সঙ্গে আরো কয়েকজন ছেলে ছিল। সবারই বয়েস কম। কারোরই দাড়িগোঁফ ভালো করে গজায়নি তখনও।

প্রভার কথার উত্তরে পাশের একটা ছেলে বলেছিল—ভোট মানেই ধাপ্পাবাজি, প্রভাদি—

প্রভা বলেছিল—কিন্তু ভোট তো সব দেশের লোকই দেয় ভাই—

এই সময় সেদিন বলেছিল—যাদের দেশে খুব টাকা আছে, তাদের দেশেই ভোট আছে প্রভাদি। আমাদের গরীব দেশ, আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভোট নেওয়া হয়, তাতে আমাদের কোনও লাভ হয় না।

—কিন্তু তাই যদি মনে করো তো ভোট না দিলেই হয়।

গণেশ বললে—সেইজন্যেই তো আপনাকে ভোট দিতে বারণ কবছি—আমরা পাড়ায় পাড়ায় সকলের কাছে গিয়েই এই কথা বলছি, দেয়ালে আলকাতবা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিচ্ছি—

প্রভা বললে—কিন্তু তোমরা কারা? কোন্ পার্টির?

গণেশ বললে—আমরা আমাদের ক্লাবের মেম্বার। এই পাড়াতেই আমাদের ক্লাব আছে! নস্কর-বাগান ক্লাব।

—কিন্তু তোমরা যে এসব করছো, এর পেছনে কে আছে?

—কেউ নেই। পেছনে আবার কে থাকবে? আমরা লেখাপড়া শিখেছি, আমরা সব বই পড়েছি, নানান রকম বই আছে আমাদের কাছে, সেই সব পড়েই আমরা সমস্ত শিখেছি।

প্রভা বললে—আচ্ছা তোমরা এখন এসো ভাই, আমাকে এখন ইস্কুলে যেতে হবে, আমার দেরি হয়ে যাবে, পরে এসো—

তা সত্যিই তারা পরে একদিন এল। সেই একদিনই নয়,

আরো অনেক দিন এল। শেষকালে দেখলে তারা ঘন ঘন আসছে।

একদিন প্রভা বললে—ভাই তোমরা আমার এখানে আসো, এটা পাড়ার লোকেরা পছন্দ করছে না। আমার বাড়িওয়ালা আমার ওপর খুব চটে গেছে—

সবাই হৈ-হৈ করে উঠলো।—বাড়িওয়ালা বুড়োকে দেখে নেবো।

সে-সব অনেকদিন আগেকার কথা। তখন সবে কলকাতায় নতুন এসেছে প্রভা। একদিন বাড়িওয়ালা করুণাকান্তবাবুর ওপরেই তারা হামলা করতে যায় আর কি!

প্রভা গিয়ে থামিয়ে দিলে। বললে—করছো কী তোমরা? তোমরা ভদ্রলোকের গায়ে হাত দেবে নাকি?

গণেশ এগিয়ে এসে বললে—প্রভাদি, আপনার ওপর অত্যাচার যে করবে তার প্রতিশোধ আমরা নেবই। আমাদের তুমি বাধা দিতে এসো না।

প্রভা বললে—ছিঃ, তোমরা না ভদ্রলোকের ছেলে সব!

সমর বললে—না প্রভাদি, ওই কথাটা বোল না তুমি। ভদ্র-লোকের মানে বদলে গেছে এখন। ভদ্রলোক মানেই বুর্জোয়া, আমরা বই পড়ে সমস্ত জেনে গেছি। ভদ্রলোক বলে বলে আমরা এতদিন অনেক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছি, এবার আর সহ্য করবো না—

কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রভার কথাতেই ছেলেগুলো গণ্ডগোল মিটিয়ে নিলে সেবার। যাবার সময় শাসিয়ে গেল করুণাকান্তবাবুকে—আর যদি আপনি কখনও প্রভাদিকে কোনও কষ্ট দেন তো আমরা ছেড়ে কথা বলবো না, তা বলে রাখছি—

ছেলেরা চলে গেল বটে, কিন্তু সেই দিন থেকেই পাড়াতে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হলো।

করুণাকান্তবাবু সকলের বাড়িতে বাড়িতে গেলেন—দেখুন আপনারা তো সবাই শুনেছেন মশাই, নিজের কানেই তো শুনেছেন

ছেলেরা আমাকে কেমন করে শাসিয়ে গেল।

সত্যিই যখন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছেলেরা করুণাকান্তবাবুকে শাসাচ্ছিল তখন নস্কর-বাগান লেনের সমস্ত লোকই শুনেছিল। কেউ-বা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আবার কেউ-বা জানালার আড়াল থেকে। কিন্তু সবাই-ই যে শুনেছিল সে সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কারোর সাহস হলো না ছেলেদের বিরুদ্ধে কিছু বলে।

হেরম্ববাবু বললেন—এটা বড় অন্যায় তো! কিন্তু ওরা কারা?

দেবসুন্দরবাবুও দাঁড়িয়ে ছিলেন একপাশে। করুণাকান্তবাবু তাঁর দিকেও একবার চাইলেন। বললেন—আপনি তো এ পাড়ায় নতুন লোক, আপনারা সবাই মিলে যদি এর প্রতিবাদ না করেন তো একদিন ওরা আপনাদেরও শাসাবে, তা আমি এই বলে রাখলুম—

দেবসুন্দরবাবু বললেন—কিন্তু আপনি ও-রকম ভাড়াটে রাখলেন কেন বলুন তো। যাকে-তাকে কি আজকাল বাড়ি-ভাড়া দিতে হয়? আজকাল দিনকাল যে খারাপ মশাই—

করুণাকান্তবাবু বললেন—তখন আমি কী করে চিনবো মশাই, কে কী-রকম লোক? দেখলুম একলা মেয়ে, ইস্কুলের টীচার, স্বভাব-চরিত্র ভাবলাম ভালো হবেই, কিন্তু এমন যে হবে আমি কী করে কল্পনা করবো?

হেরম্ববাবু বললেন—কিন্তু ছেলেগুলো কে? কারা ওরা?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আপনি থানায় খবর দিন—

হেরম্ববাবু বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবসুন্দরবাবু ঠিকই বলছেন, আপনি পুলিশে খবর দিন, অন্ততঃ ডাইরিটা করে দিয়ে আসুন, যান, আর দেরি করবেন না—আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না ওদের—যান—

দেবসুন্দবাবু বললেন—হ্যাঁ, আমিও বলি তাই, যান—

করুণাকান্তবাবু বললেন—তাহলে চলুন না আমার সঙ্গে, আপনারাও বলবেন আপনারা সবাই দেখেছেন, সবাই কানে শুনেছেন। চলুন না যাই—

দু'জনের মুখই যেন কেমন শুকিয়ে এল।

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আমি তো যেতে পারতুম, কিন্তু আমাকে যে আবার এক্ষুনি একবার কোর্টে যেতে হবে—সাক্ষী দেবার সমন আছে আমার একটা।

—তাহলে হেরম্ববাবু, আপনি অন্ততঃ চলুন আমার সঙ্গে। কেসটা তাহলে একটু জোরদার হবে।

—আমি ?

বলে হেরম্ববাবু যেন একটু ভাবলেন। তারপরে বললেন—তাহলে দাঁড়ান, এই জামাটা গায়ে দিয়ে আসি—

বলে নিজের বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

কিন্তু ভেতরে যেতেই দেখলেন অন্দর মহলে বেশ জটলা সুরু হয়েছে। বড় ছেলে, মেজ ছেলে, গৃহিণী সবাই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। বুঝলেন তাঁকে নিয়েই তাদের যত আলোচনা।

গৃহিণীই আগে কথা বললেন।

—কোথায় চলেছ ?

হেরম্ববাবু বললেন—করুণাকান্তবাবুর বাড়ির ভাড়াটের ব্যাপারে। উনি থানায় গিয়ে ডায়েরি করবেন তাই আমাকে সঙ্গে যেতে বললেন—

—তাই বুঝি জামা পরতে এসেছ ?

তারপর বড় ছেলের দিকে চেয়ে গৃহিণী বললেন—ছাখ্ ছাখ্ ভবেশ, এই মানুষটার বুদ্ধি ছাখ, নিজের বাড়ির ব্যাপার সামলাতে আমরা হিমশিম খেয়ে মরছি, উনি যাচ্ছেন পরের বাড়ির ঝামেলা মেটাতে।

বড় ছেলে ভবেশ। ভবেশের তখন অফিস যাবার টাইম হয়ে গেছে।

সে বললে—তুমি ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকছো কেন বল তো বাবা? করুণাবাবুর ভাড়াটে, করুণাবাবু বুঝবেন। ওর মধ্যে আমাদের নাক গলাবার দরকারটা কী? এর পরে যখন কোর্ট-ঘর করতে হবে, তখন সে ঝামেলা কে পোয়াবে?

গৃহিণী বললেন—সাধে কি বলি এ মানুষের ঘটে একটুকু বুদ্ধি নেই। ওই তো দেবসুন্দরবাবু, উনি তো বেশ পাশ কাটিয়ে গেলেন। হবে না কেন, এ মানুষের মত বোকা তো নন—

ছোট ছেলে নরেশ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এবার বললে—আর ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে কি আপনি পেরে উঠবেন ভেবেছেন? ওরা নস্কর-বাগান ক্লাবের ছেলে, ওরা সবাই নাম-করা গুণ্ডা—

এতক্ষণে যেন অবস্থার গুরুত্বটা বুঝলেন হেরম্ববাবু।

বললেন—তাহলে যাবো না বলছো?

গৃহিণী বললেন—তা সেটাও তোমাকে আবার বলে দিতে হবে? তোমার নিজের ঘটে একটা বুদ্ধি নেই?

—কিন্তু আমি যে করুণাবাবুকে বলে এলুম, আমি জামা পরে আসছি—

গৃহিণী বললেন—তা জামা পরে যাবে বলেছো, যাও না। কে তোমায় যেতে বারণ করছে?

হেরম্ববাবু বললেন—ওই তো তোমাদের রাগের কথা! আমি যাবো কি না বলে দাও না—

গৃহিণী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। বললেন—তুমি পুরুষমানুষ, তুমি তোমার ভালো বুঝবে না, আর আমি মেয়েমানুষ হয়ে বোঝালে তবে বুঝবে? তাহলে তুমি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালেই পারতে!

এর পরে আর কথা বলা চলে না। এ-কথায় নিতান্ত শান্ত মানুষও গরম হয়ে উঠতে পারে। হেরম্বরাবুও এতক্ষণে রেগে গেলেন।

বললেন—তাহলে তোমরা গিয়ে যা বলবার বলে দাও—

গৃহিণী বললেন—তা তোমার হয়ে কে বলতে যাবে? দোষ

করবে তুমি আর তার দায় ভোগ করবো আমরা?

হেরম্ববাবু বলা নেই কওয়া নেই, সেইখানে সেই সিঁড়ির একটা ধাপে অসহায়ের মত ধপাস করে বসে পড়লেন। তারপর দুটো হাতের পাতায় মাথাটা ধরে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন।

বললেন—তোমাদের জ্বালায় আমি জেরবার হয়ে যাবো এবার। আমি আর উঠতে পারছিনে। যা করবার তোমরা করো।

গৃহিণীর এবার বোধহয় একটু দয়া হলো। ভবেশের দিকে চেয়ে বললেন—ওরে, তুই আপিস যাচ্ছিস তো, যাবার সময় ওদের কর্তাকে বলে যা তো যে, ওর শরীর খারাপ, ব্লাড-প্রেসার বেড়েছে। উনি শুয়ে পড়েছেন।

ভবেশ আর দাঁড়ালো না। কোট-প্যান্ট তার পরাই হয়ে গিয়েছিল। সে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে গেল সদর-দরজা দিয়ে।

বাইরে করুণাকান্তবাবু তখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে হেরম্ববাবুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

ভবেশকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কী ভবেশ, তোমার বাবা কোথায়? জামা পরতে এত দেরি হচ্ছে কেন তাঁর? আমার সঙ্গে যে থানায় যাবেন বললেন—

ভবেশ করুণাকান্তবাবুর কাছে গিয়ে সবিনয়ে বললে—না কাকাবাবু, বাবা যেতে পারবেন না। তাঁর ব্লাড-প্রেসারটা হঠাৎ বেড়ে গেছে।

—তাই নাকি? ঠিক এই সময়েই কি না ব্লাডপ্রেসারটা বেড়ে গেল?

ভবেশ বললে—বাবা তো একটু উত্তেজনাও সহ্য করতে পারেন না কিনা—

করুণাকান্তবাবু বললেন—তা তুমিই একবার আমার সঙ্গে থানায় চলো না! দেখছো তো বাড়িতে মেয়েছেলে ভাড়াটে রেখে কী ঝঞ্ঝাট হয়েছে আমার। কোত্থেকে একপাল ছোঁড়া এসে আমাকে কেমন শাসিয়ে গেল বলো তো। আমি তাদের খাই, না পরি?

—তা তো বটেই, কিন্তু আমার যে ওদিকে অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে আবার। আমি তো আর এক মিনিটও দেরি করতে পারবো না—

বলে নিজের হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে বাস-রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

করুণাকান্তবাবু থানায় যাবেন বলেই তৈরি হয়ে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু এর পর আর বেরোন হলো না! একলা-একলা থানায় যেতে তাঁর ভরসা হলো না। তিনি আবার সেই বাড়ির ভেতরেই ঢুকলেন।

এই-ই হলো প্রথম অঙ্ক।

কিন্তু নাটকের প্রথম অঙ্কেই যার হট্টোগোল তার শেষ পরিণতি যে এমন করে হবে তা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। আদিযুগ থেকে এক ধারায় জীবন বয়ে আসছিল। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে চাকরি পেয়েছে, আর মেয়েরা বিয়ে করে ঘরের বউ হয়েছে, ছেলে-মেয়ে বিইয়েছে। তারপর যার সাধ্যে কুলিয়েছে সে কলকাতায় কিংবা কলকাতার আশেপাশে এক টুকরো জমি কিনে তার ওপর কোঠা বানিয়েছে। বিয়ে-শ্রাদ্ধে অন্নপ্রাশনে লোক খাইয়ে সামাজিকতা করেছে। এই-ই ছিল বাংলা দেশের বাঙ্গালীদের দু'শো বছরের রুটিন-বাঁধা ইতিকথা। এই ইতিকথাই বাঙালী-জীবনের আসল ইতিহাস।

সেই ইতিহাসের গতিপথ যে এতদিন পরে এমন করে মোড় ঘুরবে তা কেউ আগে ভাবেনি।

দেবসুন্দরবাবু একদিন ভোরবেলা উঠে পার্কে প্রাতঃভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। স্বাস্থ্য রাখতে ওটা অত্যাবশ্যক। বাড়ির সামনে এসে দেয়ালের লেখাটা দেখে চমকে উঠলেন। ভালো করে বানান করে পড়ে অবাক। কিছু মানে করতে পারলেন না কথাটার।

আরো দু'চারজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তারাও সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে লেখাটা পড়তে লাগলো।

একজন মন্তব্য করলে—ইস্, দেয়ালটা একদম নষ্ট করে দিয়েছে হে—নতুন রং করা হয়েছিল বাড়িটায়।

একজন বললে—সব পাড়াতেই মশাই অমন লিখেছে দেখলুম—

দেবসুন্দরবাবু নির্বোধের মত বললেন—বাড়িটা সবে করেছি। এর মধ্যেই এই রকম দাগী করে দিলে! আলকাতরা দিয়ে লেখা, এ তো আর উঠবে না—

প্রথম ভদ্রলোক বললে—পাড়ার ছেলেরাই বোধহয় করছে এ-সব—

দ্বিতীয়জন বললে—পাড়া-টাড়া নয় মশাই, সব পাড়ার সব ছেলেই এ-সব আরম্ভ করেছে। সেদিন একটা পাড়ায় দেখলুম লিখে দিয়েছে—'আমাদের দেশ পরাধীন, এই দেশকে স্বাধীন করতে হবে আপনাকে আমাকে সকলকে'—

—তার মানে?

এর মানে কেউ জানে না। মানে খুঁজে বেড়ায় সবাই। টালা থেকে টালিগঞ্জ যাদবপুর গড়িয়া পর্যন্ত সব পাড়ার সব বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে একই কথা লেখা।

হেরম্ববাবুও এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন লেখাটা। এককালে তিনি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তাঁর হাত দিয়ে হাজার-হাজার ছেলে মানুষ হয়ে বেরিয়ে গেছে। এখনও তাদের কারো কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা মাস্টার-মশাইএর পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

হেরম্ববাবু জিজ্ঞেস করেন—কী বাবা কেমন আছ?

তাদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারেন, কাউকে আবার চিনতে পারেন না।

বলেন—কই বাবা, তোমাকে তো চিনতে পারছিনে ঠিক—

কিন্তু আজকাল আর কেউ তাঁকে গ্রাহ্যই করে না। রেশনের দোকানে তিনি যখন গিয়ে লাইনে দাঁড়ান, তাঁর প্রাক্তন ছাত্ররাও লাইনের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ ফিরেও তাকায় না

একবার তাঁর দিকে। পা আছে

দেবসুন্দরবাবু তখনও ঠিক সামলে নিতে পারেননি নিজেকে।

হেরম্ববাবু জিজ্ঞেস করলেন—আহা, আপনার নতুন বাড়িতেও লিখে দিয়ে গেছে মশাই?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—কখন লিখলো বলুন তো মশাই?

—রাত্তিরের দিকে মই নিয়ে যে ওরা ঘুরে বেড়ায়। আমি দেখেছি যে। আমি তো ব্লাড-প্রেসারের রুগী, রাত্তিরে আমার যে ঘুমই হয় না।

দেবসুন্দরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—আপনার বাড়ির দেওয়ালেও লিখেছে নাকি?

হেরম্ববাবু বললেন—লিখেছে বইকি। হেড-মাস্টার বলে আমাকে কি আর ছেড়ে দিয়েছে ভাবছেন?

—তা আপনি যখন নিজের চোখে দেখেছেন তখন বাধা দেন নি কেন?

—ওরে বাবাঃ, হেরম্ববাবু যেন আঁতকে উঠলেন।

বললেন—ওদের তো আপনি চেনেন না। একবার ভেবেছিলুম পুলিশে খবর দিই, কিন্তু জলে বাস করে কি কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায়? আমি তো পাগল নই। আর আমার চেয়ে বড় বড় লোকের সব বাড়িতে এই রকম লিখে দিয়েছে। সেদিন দেখলুম ভবানীপুরে ডাক্তার হীরালাল বোসের নতুন তিন-তলা বাড়ির আগা-পাছতলায় বড় বড় অক্ষরে অ আ ক খ লিখে দিয়েছে—

দেবসুন্দরবাবু কী আর বলবেন। সবাই যদি নির্বিবাদে সব কিছু সহ্য করে যায় তো কোনও অন্যায়েরই কোনও প্রতিকার হবে না কখনও।

যে-ঘটনা নস্কর-বাগানে ঘটতে লাগলো সেই ঘটনা তারপরে ছড়িয়ে গেল সারা কলকাতাতেই। শুধু কলকাতা নয়, সারা বাংলাদেশেই। অনেক দিন মানুষ মুখ বুঁজে সব সহ্য করে গেছে। তেইশ-চব্বিশ বছর ধরে শুধু আশার বাণী আর আশ্বাস। আশ্বাসে

...রেছে কিন্তু পেট ভরেনি।

যখন নস্কর-বাগান ক্লাবের ছেলেদের টাকার অভাব হয়েছে তখনই গণেশ আর সমরের দল ছুটে এসেছে।

—প্রভাদি, পাঁচটা টাকা দাও—

প্রভা পাঁচটা টাকা দিয়ে বলেছে—খুব সাবধানে থাকবি ভাই তোরা। সবাই তোদের বিরুদ্ধে, সবাই রেগে গেছে তোদের ওপর।

সমর বলেছে—রাগুক গে, আমরা কাকে পরোয়া করি? নিজের বাপ-মা'ই রেগে গেছে আমাদের ওপর, তা পর যারা তারা তো রাগবেই। গণেশদা তো ইনজিনীয়ারিং পাশ করে তিন বছর বসে আছে। আমিও তো বি.এস-সি ফার্স্ট-ক্লাশ পেয়ে বেকার। এম্. এস্-সিতে ভরতি হতেই পারলুম না। বাপের হোটেলে ভাত খাচ্ছি আর সঙ্গে সঙ্গে লাথি-ঝাঁটা খাচ্ছি, আমাদের সকলের অবস্থাই যে তাই প্রভাদি, অথচ···

গণেশ বাকিটা বললে। বললে—অথচ পার্টিগুলো দেখ, তারা কী করে মিনিস্ট্রি পাবে তাই নিয়ে রিসার্চ চালাচ্ছে, আমাদের বেকারদের চাকরি দেবার কোনও আন্দোলন করছে না। শুধু যারা চাকরি পেয়েছে তাদের মাইনে কিসে বাড়ানো যায়, সেই নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে—

টাকাটা নিয়ে তারা চলে যাচ্ছিল। যাবার আগে গণেশ আবার দাঁড়ালো।

বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা, বাড়িওয়ালা তোমার ওপর আর কোনও জুলুম করছে না তো প্রভাদি?

সমর বললে—আর করবে না। আর জুলুম করবার সাহস হবে না বুড়ো-ব্যাটার—

প্রভা জিজ্ঞেস করলে—কেন, কীসে বুঝলি তুই?

—ওরা যে থানায় গিয়েছিল ডায়েরি করতে, পুলিশ কিছু স্টেপ্ নেয়নি। পুলিশ বলেছে—আমাদের অত সময় নেই। আর পুলিশও

জানে, যদি কিছু স্টেপ্ নেয় তো আমাদের হাতেও বোমা আছে পাইপগান আছে—

—কিন্তু তোরা খুব সাবধানে থাকিস ভাই!

গণেশ বুক ফুলিয়ে বলেছে—সাবধানে থেকে আর লাভ হবে না প্রভাদি, যেমন ভাবে আছি এর চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো। আমি চাকরি পাচ্ছি না বলে, পৃথিবীসুদ্ধ লোক লাথি-ঝ্যাটা মারছে, এ আর কদ্দিন সহ্য করবো। তবে যাবার আগে সকলকে জানিয়ে দিয়ে তবে যাবো, এইটে তোমাকে বলে রাখলুম—

এই ঘটনার পরেই লালবাজার থেকে একদল পুলিশ এল নস্কর-বাগানে আর ডুম্-দাম্ গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ সুরু হলো। বাড়ির ভেতরে বসে দেবসুন্দরবাবু শুনলেন। হেরম্ববাবু শুনলেন। করুণাকান্তবাবুও শুনলেন। সবাই-ই শুনলো। সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল মাঝ-রাত্রে। মনে হলো কাছাকাছি কোথাও যেন একটা লড়াই হচ্ছে।

ব্লাড-প্রেসারের রুগী হেরম্ববাবু। এক-একটা শব্দ হচ্ছে আর হিসেব রাখছেন। এক-এক করে গুণছেন—এক-দুই-তিন······

দেবসুন্দরবাবুর স্ত্রী দেবসুন্দরবাবুর পাশেই শুয়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন—এ কী রকম পাড়ায় বাড়ি করলে গো তুমি! আগে আমাদের ভাড়াটে বাড়িই তো ভালো ছিল এর চাইতে!

ওদিকে করুণাকান্তবাবুও আওয়াজ শুনতে শুনতে বেশ খুশী হয়ে উঠলেন। গৃহিণীর দিকে চেয়ে বললেন—শুনছো তো? ওই শোন, তেইশ রাউণ্ড হলো।

গৃহিণী বললেন—শেষকালে কোনও গণ্ডগোল হবে না তো গা?

—গণ্ডগোল? গণ্ডগোল কিসের?

—পাড়ার ছেলেরা যদি শেষকালে ক্ষেপে যায়? ক্ষেপে গিয়ে যদি আমাদের বাড়িতে বোমা ফেলে?

করুণাকান্তবাবু বললেন—তুমি ক্ষেপেছ? পুলিশ সবাইকে অ্যারেস্ট করবে না? গভর্নমেন্ট নেই দেশে? গভর্নমেণ্টকে ট্যাক্সো

দিচ্ছি নে? তারপরে কেল্লা রয়েছে, সেখানে কেল্লা ভর্তি সোলজার রয়েছে কী করতে? বখাটে ছোঁড়ারা যা ইচ্ছে তাই করবে ভেবেছ?

গৃহিণী বললেন—তা তোমারই তো দোষ! তুমিই তো ওই ছুঁড়িটাকে এনে বাড়িতে ঢোকালে। ও আসবার আগে তো কোনও কিছ্ছু হ্যাঙ্গাম ছিল না—

কিন্তু একতলার ঘরের মধ্যে প্রভাও শব্দগুলো শুনছিল। তারও ভয় করছিল। গণেশদের ওপরেই হামলা হচ্ছে নাকি? ওদেরই ধরে নিয়ে যাবে নাকি শেষকালে? আরো মনে পড়লো বাবার কথা। বাবার চিঠি এসেছে রায়পুর থেকে। বাবা আসছে কলকাতায় তার কাছে! ঠিক এই সময়েই কিনা বাবার আসতে হয় এখানে!

তখনও দুম-দাম আওয়াজ চলেছে একটানা।

প্রভার আবার মনে হলো—ভাঙুক। সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাক।

আর ঠিক সেই সময়ে জানালায় আস্তে আস্তে একটা টোকা পড়লো। প্রভা উঠে নিঃশব্দে দরজা খুলে দিলে। খুলতেই গণেশ, সমর, ভোলা, ফটিক সবাই এসে ভেতরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো।

গণেশ বললে—দরজা বন্ধ করে দাও প্রভাদি, আমাদের বোমা ফুরিয়ে গিয়েছে—ওরা তাড়া করেছে আমাদের।

প্রভা তাড়াতাড়ি দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়েছে নিঃশব্দে।

ঠিক এর পরই কলকাতায় মেয়ের বাড়িতে এসে হাজির হলেন ভৈরববাবু। কলকাতাময় তখন পুরো সন্ত্রাসের রাজত্ব। এই বাংলা দেশই একদিন চৈতন্যদেব, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম দিয়েছে, জন্ম দিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের। সেই বাংলা দেশেরই হাল দেখে ভৈরববাবু চমকে গেলেন।

বললেন—এ কী হাল হলো মা বাংলা দেশের? এ-রকম তো ছিল না আগে?

প্রভা জিজ্ঞেস করলে—কীরকম ছিল না?

—এই এখানকার ছেলে-মেয়েদের কথা বলছি। ছোট-ছোট ছেলেমানুষ সব, বাপের বয়সী লোকেদের সামনে সিগারেট-বিড়ি খায়। এটা তো ভালো লক্ষণ নয় মা, এতে যে সব গোল্লায় যাবে।

প্রভা বললে—তুমি আজকালকার ব্যাপার কিছু জানো না, তুমি চুপ করে থাকো—

ভৈরববাবু বুঝতে পারেন না তবু। বললেন—আমি বুঝতে পারি না? আর তোরাই সব বুঝিস? আমি কি লেখাপড়া শিখিনি? আমি সেকালের লোক বলে কি সূর্যও পশ্চিমদিকে উঠবে? সূর্যও তো সেকেলে, তা'বলে কি সে আলো দিচ্ছে না? রোদ উঠছে না?

প্রভা বললে—সূর্য আর মানুষ তো এক নয় বাবা। সূর্য বদলায় না, কিন্তু মানুষের সমাজ বদলায়, যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও 'অ্যাডজাস্ট' করে নিতে হয়, নইলে সে টেকে না।

ভৈরববাবু বললেন—কিন্তু তা'বলে ভদ্রতা সভ্যতা সামাজিকতা সততা সবকিছু পালটে যাবে মা? পাপ-পুণ্য-অধর্ম-ধর্ম বলে কিছু থাকবে না?

প্রভা বললে—তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বোল না বাবা! তুমি যেসব কথা বলছো ওসব আজকে আর চলে না। তুমি বরাবর রায়পুরে থেকে এসেছ তাই ওসব কথা বলছো। কলকাতায় থাকলে তোমার মত বদলে যেত। এখানে পাপ-পুণ্য-ধর্ম-অধর্ম বলে কিছু নেই। আছে কেবল বেঁচে থাকার লড়াই—

ভৈরববাবু মেয়ের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর কাছে মানুষ হয়ে এ মেয়ে এমন কথা বলতে শিখলো কার কাছে? কে তাঁর মেয়েকে এ-সব কথা শেখালে? এই কলকাতায় এমন কী ঘটলো যে তাঁর মেয়ে এই ক'বছরে এমন করে বদলে গেল?

বললেন—তোর সঙ্গে তর্ক করে পারবো না বাপু, জন্তু-জানোয়াররাও তো বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই করে, তাহলে তাদের সঙ্গে মানুষের তফাতটা আর রইলো কোথায়?

বাড়ির ভেতরে প্রভার কাছে যা শুনলেন, বাড়ির বাইরে গিয়েও ভৈরববাবু তাই দেখতে পেলেন। ট্রামে উঠে কেউ ভাড়া দেবে না। টিকিট চাইলেই গোলমাল পাকাবে। ভদ্রলোকের ছেলেরা মুখ-খিস্তি করবে অশিক্ষিত লোকদের মতন। ফরসা চকচকে জুতো দেখলে মাড়িয়ে দেবে। কেউ ভালো গাড়িতে চড়লে রাস্তা ছেড়ে দেবে না। অথচ তার জন্যে যদি কেউ চাপা পড়ে তো ড্রাইভারকে মেরে গাড়ি পুড়িয়ে দেবে।

কিন্তু সবচেয়ে যেটা খারাপ লাগলো সেটা ঘটলো পার্কের মধ্যে। ছেলেটা তাঁকে বাড়িতে এসে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল, তাই। নইলে কী হতো!

রাত্রে সেই কথাগুলোই শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন। তাঁর ওপর এত দয়া হলো কেন ছেলেটার! দয়া-মায়া যে একেবারে নেই তা তো নয়! বুড়ো-মানুষ দেখেই তো দয়া দেখিয়েছে ছেলেটা!

হঠাৎ মনে হলো প্রভা যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। যেন অচেনা লোকের গলা।

তিনি ডাকলেন—প্রভা, ও প্রভা—

সমর তখন গলা নামিয়ে নিয়েছে। বললে—ওই তোমার বাবা জেগে উঠেছে প্রভাদি—আমি যাই—

প্রভাও গলা নামিয়ে নিলে।

বললে—কিন্তু গণেশ এরকম ভুল করলে কেন বল্ তো? পটাশিয়াম ক্লোরেট কি বেশি দিয়ে ফেলেছিল?

সমর বললে—না প্রভাদি, তোমাকে পরে সব বলবো, আমি যাই, এতক্ষণে পুলিশ বোধহয় গণেশদার ডেড্‌বডি নিয়ে চলে গেছে—তুমি দরজা বন্ধ করে দাও।

তারপর যাবার সময় বলে গেল—কিন্তু এও বলে রাখছি, এর বদ্‌লা আমরা নেবই, তখন তুমি আমাদের কিছু বলতে পারবে না—

—কিন্তু যা করিস, খুব সাবধানে করিস ভাই, তোদের জন্যে

আমার খুব ভয় করে রে—

কিন্তু ততক্ষণে সমর সেই মাঝ-রাত্রের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ভৈরববাবু তখনও ডাকছেন—ও প্রভা, প্রভা, কার সঙ্গে কথা বলছিস্ রে? ও কে? কে এসেছে?

প্রভা এতক্ষণে গলা চড়িয়ে বললে—এই তো আমি! কী বলছো তুমি?

ভৈরববাবু বললেন—তোর ঘরে যেন কার গলা শুনতে পেলুম মনে হলো—

প্রভা বললে—তুমি স্বপ্ন দেখছো নাকি? আমার ঘরে আবার কে আসবে? তুমি ঘুমোও। তুমি নিজেও ঘুমোবে না, আমাকেও ঘুমোতে দেবে না—

ভৈরববাবু আর কিছু বললেন না। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মন থেকে দুশ্চিন্তা গেল না। বার বার ভাবতে লাগলেন এসব কী হচ্ছে! তাঁর ছোটবেলায় তো এমন ছিল না! সে যুগেও এমন হয়েছে। উল্লাসকর ক্ষুদিরামরা বোমাবাজি করেছে। কিন্তু সে তো অন্যরকম। এরা কার বিরুদ্ধে লড়ছে? কে এদের শত্রু!

পরের দিন ভোরবেলা খবরের কাগজ পড়েই সব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অত যে শব্দ হয়েছে কাল রাত্তিরে, তার বিশদ বিবরণ বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। গণ্ডগোলটা যে একেবারে তাঁদের নস্কর-বাগানের মধ্যেই হয়েছে এটা তখন তিনি বুঝতেই পারেননি। নস্কর-বাগান পার্কের মধ্যে নাকি কয়েকজন তরুণ পুলিশের ভ্যান লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। তারপর পুলিশ তাদের তাড়া করে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে। সেখানে একটা ক্লাবঘরের মধ্যে অনেক পটাশিয়াম ক্লোরেট, আর্সেনিক ডি-সালফাইড আর পিক্‌রিক এ্যাসিড পায়। একটা বোমা ফেটে গিয়ে তরুণদের একজন (নাম গণেশ সরকার) সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। পুলিশ সমস্ত

অঞ্চলটা পাহারা দিচ্ছে।

ভোরবেলাই প্রভা রান্না চড়ায়। রান্না চড়িয়ে রেখে চা খেয়ে তীর্থময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াতে যায়।

ভৈরববাবু তাড়াতাড়ি প্রভার কাছে খবরের কাগজটা নিয়ে গিয়ে বললেন—ওমা, এই ছাখ্ মা, আমাদের পাড়ায় কী সমস্ত কাণ্ড হয়েছে কাল রাত্তিরে। আমি কাল রাত্তিরেই তোকে বললুম, তুই বললি ও কিছু না—দেখেছিস, গণেশ সরকার বলে একটা ছেলে বোমা ফেটে মারা গেছে—

প্রভা সে কথায় কানও দিলে না, যেমন রান্না করছিল তেমনিই রান্না করতে লাগলো। শুধু বললে—ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না বাবা, তুমি চা খেয়ে নাও—

সেদিন দিন-তুপুরেই ঘটনাটা ঘটলো। সে এক বীভৎস কাণ্ড। ভৈরববাবু তখন সবে খেয়ে উঠেছেন। ভরতুপুর, হঠাৎ বাইরের গলিতে একটা হৈ-চৈ উঠলো। চারদিক থেকে চিৎকার উঠলো—ধরো ধরো পাকড়ো—

ভৈরববাবুর আর বিশ্রাম করা হলো না। তাড়াতাড়ি জানালার সামনে এসে রাস্তার দিকে চাইলেন। মেয়েকে ডাকলেন—ওমা প্রভা, রাস্তায় কী হলো ত্যাখ্ এসে—

তারপর যা দেখলেন তাতে তাঁর দম বন্ধ হবার জোগাড়।

—ও মা দেখবি আয় রে, দেখবি আয়, আহা হা—

প্রভা তাড়াতাড়ি এসে জানালাটা বন্ধ করে দিলে। বললে—তোমাকে তো বলেছি ওসব তোমাকে দেখতে হবে না, তুমি খেয়ে উঠেছ, একটু গড়িয়ে নাও না—

ভৈরববাবু বললেন—কিন্তু ওরা যে লোকটাকে ছুরি মারলে রে—আমি দেখলুম একজন ছেলে রক্ত-মাখা ছোরা হাতে ওই গলির দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল—

—কিন্তু তোমার ওসব ব্যাপারে থাকবার দরকার কী? তুমি বুড়ো মানুষ, শেষকালে পুলিশ এসে যদি আবার আমাদের হ্যারাস করে, তখন?

—তা বলে একজন লোককে বিনা-কারণে খুন করে গেল, আর আমি চুপ করে থাকবো? আমার দেখলেও দোষ?

—না, কারণে মারলে কি বিনা-কারণে মারলে তা তুমি জানলে কী করে? তোমাকে ওসব দেখতে হবে না। তুমি খাও-দাও আরাম করো।

ভৈরববাবু কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। কিন্তু মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। আহা, লোকটাকে জলজ্যান্ত মেরে ফেললে ওরা। তিনি বিছানায় গিয়ে হেলান দিয়ে শোবার চেষ্টা করলেন একবার। কিন্তু পারলেন না। আবার উঠলেন। আবার শুলেন। আবার উঠে বসলেন।

তারপর আস্তে আস্তে মেয়ের ঘরের দিকে গেলেন।

—হ্যাঁ রে প্রভা, তুই যে কিছু বলছিস নে!

প্রভা মুখ তুলে বললে—কী বলবো?

—লোকটাকে যে পাড়ার মধ্যে খুন করে গেল। এখনও জায়গাটা একেবারে রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেখলুম। একটা জলজ্যান্ত লোককে মারলে কোনও মানুষ চুপ করে থাকতে পারে? তুই কিছু বলবি নে?

প্রভা বললে—আমি কী বলবো?

—একটা কিছু কথা বল! এই ধর একদিন যদি আমাকেই ওরা মারে। আমিও তো রাস্তায় হাঁটি। কথা নেই বার্তা নেই, আমাকেই যদি ওরা খুন করে ফেলে, তখনও তুই কিছু বলবি নে?

প্রভা বললে—তোমার কোনও ভাবনা নেই, তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। তোমাকে নিয়ে কারোর অত মাথা ব্যথা নেই। ওরা তো আর পাগল নয়—

—কিন্তু তুই? তুইও তো ইস্কুলে যাতায়াত করিস। তোকেও তো রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে হয়। তোরই যদি কিছু হয়, তখন? তখন কি হবে?

প্রভা বললে—যখন হবে তখন হবে!

ভৈরববাবু বললেন—তাই বললে কি হয়, সহরে তো থানা-পুলিশ আছে। আমিই না হয় থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি। আহা হা, আমরা থাকতে লোকটা ওইখানে ওই রকমভাবে পড়ে থাকবে? একটা ডাক্তারকেও না-হয় ডেকে আনতুম—

প্রভা যেন পাথর। ভৈরববাবু অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরই

মেয়ে হয়ে প্রভা এ-রকম পাথর হতে পারলো কী করে? এ মেয়ে তো এমন ছিল না। তিনি যেন কলকাতায় এসে পর্যন্ত তাঁর নিজের মেয়েকেই চিনতে পারছেন না। রায়পুরে যখন ছিল তখন তো প্রভা অন্যরকম ছিল। বাবা যা বলেছে তাই-ই শুনেছে। এই ক'বছরেই একেবারে বদলে গেল কেন? কী হলো এখানে?

ভৈরববাবুর সমস্ত শরীরটার ভেতরে রক্তগুলো যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগলো। কিন্তু রাস্তায় তখন সত্যিই বীভৎস দৃশ্য দেখতে পেলে অনেকেই।

দেবসুন্দরবাবুও তখন তামাক খেতে খেতে জানালার ধারে বসে খবরের কাগজটায় চোখ বুলোচ্ছিলেন। একবার পড়া খবরগুলো আর একবার পড়ছিলেন। হঠাৎ রাস্তার ওপর চিৎকার শুনেই চোখ ফিরিয়ে যা দেখলেন তাতে মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। দেখলেন একজন মাঝবয়সী লোককে কয়েকজন ছুরি মারতেই ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগলো।

কোথা থেকে চিৎকার উঠলো—ধরো-ধরো—পাকড়ো-পাকড়ো—

রাস্তায় আরো কিছু লোক যাচ্ছিল আগে-পেছনে। চিৎকারটা শুনে ধরবার বদলে যে-যেদিকে পারলে দৌড়তে লাগলো। খানিক-ক্ষণের মধ্যেই রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। যে-ছেলেটা ছোরা মেরেছিল তার লম্বা জুলফি, হলদে সার্ট, আর টাইট ট্রাউজার পরনে। দলে আরো কয়েকজন ছিল। তারাও আর দাঁড়ালো না, যে-যেদিকে পারলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকটা তখন চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। মাঝে-মাঝে সামান্য একটু নড়া-চড়া করছে। তারপর এক-সময়ে একেবারে স্থির হয়ে গেল। আর রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে নর্দমার দিকে চলতে লাগলো।

গৃহিণী তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরের ঘরের দিকে আসছিলেন। এসেই ওই কাণ্ড দেখে হাউমাউ করে উঠলেন।

বললেন—ওমা, ও কী গো? কে মারলে গা লোকটাকে?

এতক্ষণে যেন দেবসুন্দরবাবুর হুঁশ হলো।

বললেন—আরে, তুমি আবার কেন এখানে এলে ?

বলেই দড়াম্ করে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলেন। বললেন—ও-সব ব্যাপারে আমাদের থাকতে নেই—

তারপর যেন হঠাৎ খেয়াল হলো। বললেন—রঘুবীর কোথায়, রঘুবীর ?

—বাসন মাজতে বসেছে—

—আর কমলা ?

—কমলা রান্নাঘর ধুচ্ছে, এইবার আমার জন্যে পান আনতে যাবে দোকান থেকে।

দেবসুন্দরবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন—না না, আজ আর পান খেও না তুমি, পান আনতে হবে না। একদিন পান না-খেলে কী হয় ?

তারপর এক নিমেষে সামনের জানালার পাল্লা দুটোও সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। তারপর ঘরের যতগুলো জানালা আছে সবগুলো বন্ধ করে দিলেন টপাটপ্।

বললেন—চলো চলো, ভেতরে চলো। তুমি আবার এ-সময়ে বাইরের ঘরে আসতে গেলে কেন বলো দিকিনি ? মহা জ্বালাতন হয়েছে দেখছি—

গৃহিণী বললেন—কে খুন করলে তুমি দেখেছ নাকি ?

দেবসুন্দরবাবু ঠেলতে ঠেলতে গৃহিণীকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বললেন—কে আবার খুন করবে ? ওই যারা তোমার বাড়ির দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে হরিনাম লিখে রেখে গেছে, তারাই।

—তা, কেন খুন করলে ? কী করেছিল লোকটা ?

—তোমার ও-সব কথা জেনে দরকার কী শুনি ? তুমি খেয়ে উঠে শুতে গেলে না কেন ? যেমন রোজ যাও ?

গৃহিণী বললেন—আমার যে পান আসেনি। পান মুখে না দিলে কি ঘুম আসে ?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—পান খেয়ে দরকার নেই আজ। একদিন

না-হয় না-ই খেলে পান? আর এমন নেশার কথাও তো কখনও শুনিনি যে নেশা না করলে ঘুম আসবে না—

—তা তুমি তামাক খাও না? খেয়ে উঠে তোমার তামাক না হলে চলে?

এ-কথার উত্তর না দিয়ে দেবসুন্দরবাবু ডাকলেন—রঘুবীর—রঘুবীর—

রঘুবীর বাসন মাজতে মাজতে উঠে এল।

বললে—বাবু—

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আজ তুই বাইরে যেতে পারবি না। আর কমলা? কমলা কোথায়?

কমলা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সামনে এল। সামনে এসে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়াল।

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আজ আর বাইরে যেতে পারবে না বাছা তুমি। রাস্তায় গণ্ডগোল হচ্ছে, পান আনতেও যেতে হবে না। আজকে তোমার মা পান খাবে না—বুঝলে?

বলে ওপরে দোতলায় উঠে একটা তালা নিয়ে এলেন। তারপর সদর-দরজায় ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে বললেন—এই তালা লাগিয়ে দিলুম, খুলে দেব সেই সন্ধ্যাবেলা। তার আগে সব বাড়িতে চুপচাপ শুয়ে থাকো—

বলে আবার ওপরে উঠে গেলেন। গিয়ে ওপরের সব জানালা আর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু হেরম্ববাবু ব্লাড-প্রেসারের রুগী। ভবেশ নরেশ তখন অফিস-কলেজে চলে গেছে। তিনি আর গৃহিণী দু'জনে একসঙ্গে আহারে বসেছেন। হঠাৎ রাস্তায় 'ধরো-ধরো পাকড়ো'র শব্দ শুনে আর থাকতে পারলেন না। এঁটো হাতে জানালার ধারে আসতেই দেখলেন একদল ছেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। আর একজন ভদ্রলোক রাস্তায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। তার সারা বুকের কাছটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে—

—ওগো, সব্বনাশ হয়েছে—

গৃহিণী খেতে খেতেই বললেন—কী হলো?

—আমার বুক কেমন করছে, মাথা গেল।

গৃহিণী বললেন—তুমি ব্লাড-প্রেসারের রুগী, ওই সব ঝামেলার মধ্যে যাও কেন বলো তো? কী, হলো কী?

—ওগো, সেই ছোঁড়ার দল, যারা করুণাবাবুর বাড়িতে হামলা করেছিল, তারা একটা লোককে খুন করে পালিয়ে গেল—সেই জুলফিওয়ালা ছেলেটা···

—তা তুমি ও-সব দেখতে গেলে কেন? কে দেখতে বললে তোমাকে? আমি তোমাকে পই-পই করে বারণ করিনি না যে, ঝামেলার মধ্যে যেও না, এখন কী হবে? তুমি তো সেবারে করুণাবাবুর হয়ে থানাতে সাক্ষী দিতে যাচ্ছিলে—

হেরম্ববাবু তখনও থর-থর করে কাঁপছেন। বললেন—আমি আর খাবো না—

বলে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখনও তাঁর চোখের সামনে ভাসছে লোকটার রক্তমাখা শরীরটা। আর সেই ছেলেটার চেহারাটাও

ভেসে উঠলো চোখের ওপর। সেই লম্বা জুলফি, হলদে সার্ট, আর টাইট্ প্যাণ্ট্—

বিছানায় গিয়ে তিনি ধপাস করে শুয়ে পড়ে হাঁফাতে লাগলেন। হাঁপাতে হাঁপাতেই চেঁচিয়ে বললেন—ওগো, আমার ওষুধের বড়িটা দিয়ে যাও শিগ্গির—

পাড়ার সব বাড়িতে যারা যারা বাইরে অফিসে, কাজে-কর্মে ব্যস্ত ছিল, তারা সন্ধ্যের মুখে ফিরে এল। কিন্তু নস্কর-বাগান লেনের মুখেই পুলিশের ভিড় দেখে চমকে গেল।

—কী হয়েছে মশাই এখানে?

যারা সাবধানী লোক তারা কোনও দিকে না চেয়ে সোজা মাথা নিচু করে বাড়ি ঢুকলো। বাড়ির সামনে সমস্ত গলিটাই ফাঁকা। সব বাড়ি অন্ধকার, জানালা দরজা পর্যন্ত বন্ধ। এ-পাড়ায় যে মানুষ বাস করে তা যেন দেখে বোঝা যায় না। থমথমে ভাব চারদিকে। নিশ্চয় এ-পাড়াতে আজ কিছু হয়েছে।

—ও মশাই ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? দেখছেন না একদল পুলিশ ঘাটি করে রয়েছে!

—আরে মশাই, আমার বাড়ি যে নস্কর-বাগান লেনে। পুলিশ কি বাড়িতেও যেতে দেবে না নাকি আমাদের? কী হয়েছে ওখানে?

—পুলিশ খুন হয়েছে।

—পুলিশ?

—হ্যাঁ মশাই, পুলিশ। নস্কর-বাগান থানার ও-সি। থানার ও-সি প্লেন ড্রেসে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল. পেছন থেকে কে এসে তাকে ছোরা মেরেছে।

—তারপর কী হলো?

—তারপর আর কী হবে। যা হবার তাই হয়েছে। ও-সি'কে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ, তার আগেই ও-সি ডেড্—

শুনে সকলেরই চক্ষুস্থির! এই ক'দিন আগে বেলগাছিয়ায় মারা

গেছে একজন পুলিশ। তার আগে আর একজন মারা গেছে সিঁথিতে। জিপ্ চড়ে যাচ্ছিল, পাশের বাড়ির ছাদ থেকে কে একজন বোমা ফেলেছিল সেই জিপ্ লক্ষ্য করে। দু'-একজন রাস্তায় চলতে চলতে গল্প শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে। যেন আরো কিছু শুনতে চায়। আরো কিছু শুনে রোমাঞ্চ পেতে চায়। সেই একঘেয়ে জীবন চলে আসছিল এতদিন। সেই বাঁধা-ধরা হরতাল, নয়তো সেই অফিসের ইউনিয়নের ডাকে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করা। আর 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলে চেঁচানো। আর ঠিক তারিখে ঠিক সময়ে মাইনে নেওয়া। আর তারপর মাসের দশ তারিখের মধ্যেই মাইনের সমস্ত টাকা ফুরিয়ে যাওয়া।

এ-সব তো আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল মশাই। আমরা তো জানতুম অফিস মানেই ইউনিয়ন। আর ইউনিয়ন মানেই মিছিল। আর মিছিল মানেই ইনক্লাব জিন্দাবাদ। আর কামাই? যতদিন ইচ্ছে কামাই করো না, কারো বাপের সাধ্যি নেই তোমার মাইনে কাটে। এতেও আমাদের ভালো লাগছিল না। হঠাৎ এবার যেন লড়াইটা আরো জমলো।

বাসে করে যাচ্ছিল একটা ছেলে। ভিড় দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়েছে।

—ও দাদা, টিকিট?

টিকিট! বলে কী! টিকিট কখনও জীবনে কেটেছি যে টিকিট চাইছো?—ছেলেটা নেমেই কণ্ডাকটারের দিকে জিভ দেখালো। অর্থাৎ ভেঙচি কাটলো। বাসটা তখন উর্ধ্বগতিতে ছুটে চলেছে। টিকিটের পয়সা নেবারও উপায় নেই, আর ইচ্ছে থাকলে পয়সা দেবারও উপায় নেই।

একজন প্যাসেঞ্জার বললে—আরে, আজকালকার ছেলেরা কী রকম ঠগ্‌বাজ দেখলেন মশাই?

পাশ থেকে কে একজন ফোঁড়ন কাটলো—পয়সা দেয়নি বেশ করেছে। কেন দেবে মশাই পয়সা?

—কেন দেবে না ? বিনা পয়সায় বাসে চড়বে তা'বলে ? এতে কার লস্ ? গভর্ণমেণ্টের। আর গভর্ণমেণ্টের লস্ মানেই তো আমাদের লস্, এটা বোঝে না কেউ ?

আর এক ভদ্রলোক ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠলো—এ-কি গভর্ণমেণ্ট মশাই ? এর নাম গভর্ণমেণ্ট ? এ-তো চোর, এ-তো ডাকাত।

—ডাকাত মানে ?

—ডাকাত নয় তো কী ? দিল্লীতে গিয়ে দেখে আসুন সাড়ে চার লক্ষ টাকা করে এক-একজন মিনিস্টার বছরে মাইনে পাচ্ছে, তা জানেন ? দিনকে দিন কেবল মিনিস্টারই বেড়ে চলেছে। বাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট, চাকর, দারোয়ান, ফার্ণিচার, সব মিলিয়ে হিসেব করুন না কত হয়।

বাসের মধ্যে তখন ফাটাফাটি ভিড়। গরমে ঘামে, তর্কে ভিড় তখন বেশ সরগরম। নিতান্ত সুস্থ লোকও সে-গরমে অসুস্থ হয়ে ওঠে।

একজন অবাক হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলে—সাড়ে চার লক্ষ ?

—হ্যাঁ মশাই, চার লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা। এ আমার গাল-গল্প নয় মশাই। মিস্টার ডাণ্ডেকার, এম-পি, এই হিসেব দিয়েছেন। বাজে লোক নয় ডাণ্ডেকার, একজন রিটায়ার্ড আই-সি-এস, এককালে নিজে ইনকাম-ট্যাক্স-কমিশনার ছিলেন—

তখন বাসের মধ্যেই তত্ত্বকথা সুরু হয়ে যায়। কিন্তু বাস-ড্রাইভার সেই মানুষের পাহাড় নিয়েই হু-হু করে নিজের গন্তব্য স্থানের দিকে এগিয়ে চলে।

কিন্তু যে-ছেলেটা চলতি বাস থেকে নস্কর-বাগানের মোড়ে নেমে পড়েছে তার তখন মহা উৎসাহ। এ-পাড়ায় সে থাকে না, এ-পাড়ায় আসবার তার দরকারও হয় না। কিন্তু কেন এত ভিড় হয়েছে এখানে, সে-কারণটা জানতে না পারলে যেন রাত্রে তার ঘুম হবে না। কিছু উত্তেজনা, কিছু রোমাঞ্চ, কিছু হৈ-চৈ না হলে কি

ভালো লাগে কারো ?

—হ্যাঁ মশাই, এখানে এত পুলিশ কেন ? কী হয়েছে ?

ভিড় ঠেলে একেবারে ভিড়ের কেন্দ্রে গিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলে ছেলেটা।

কে একজন দয়া করে উত্তর দিলে—একটা পুলিশ-অফিসার খুন হয়েছে—

—বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। বড় জ্বালাচ্ছিল ব্যাটারা। সবাই মিলে বলছি সহর থেকে পুলিশ তুলে নিক, সি-আর-পি তুলে নিক। এত মাইনে দিয়ে পুলিশ পুষে লাভ কী ?

কয়েকজন ছেলেটার দিকে চেয়ে দেখলে। এ-সব ছেলেদের সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। কিন্তু তাতে ছেলেটার কোনও বিকার নেই। সে নিজের মনেই বলে চললো—সব পুড়ে-ঝুড়ে যাক, সব মরে যাক, আবার নতুন করে সব গড়ে উঠবে।

একজন বলে উঠলো—সবাই মরলে কি আপনিই বাঁচবেন ?

ছেলেটা বললে—আমার বেঁচে লাভ কী মশাই ? আমাকেও কেউ মেরে ফেলুক না। আমি তো মরতেই চাই—

—তা মরেন না কেন ?

ছেলেটা বললে—আমি কেন আগে মরবো ? আগে আপনাদের সকলকে মেরে তবে মরবো। সব পুলিশ ব্যাটাকে আগে মারবো, সব বড়লোককে আগে মার্ডার করবো, সব বাড়িওয়ালাকেও আগে খুন করবো, তবে মরবো। আমাদের মারা যাবার পর তখন যদি নতুন করে আবার অন্য সোসাইটি গড়ে ওঠে—

কিন্তু কথা আর বেশিদূর গড়ালো না। ভ্যানে করে একদল পুলিশ এসে হাজির হলো হুড়মুড় করে। আর ভ্যান থেকে একজন পুলিশ লাঠি নিয়ে তাড়া করে এল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছত্রভঙ্গ।

কাছাকাছি কোথা থেকে একটা বোমা এসে পড়লো। দুম করে একটা বিকট শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মারমুখী হয়ে উঠেছে। আর তখন যে-যেদিকে পারলে ছুটে পালালো। সঙ্গে

সঙ্গে ট্রাম-বাস, রিক্‌শা, টেমপো, প্রাইভেট কার সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তা অন্ধকারে ডুবে গেল এক মুহূর্তে।

ভৈরববাবুই এতে সবচেয়ে বেশি মুশকিলে পড়লেন। অথচ যাদের সত্যিই মুশকিলে পড়বার কথা তারা যেন জিনিসটা তেমন গায়ে মাখছে না। তারা দিব্যি অফিস যাচ্ছে, সিনেমা দেখছে, যাত্রা শুনছে। কলকাতা সহরে বিয়েও হচ্ছে। বিয়েবাড়িতে ম্যারাপও বাঁধা হচ্ছে। লুচি-মাংস-পোলাউ-দই-মিষ্টি সবই খাচ্ছে। চারদিকে এত হৈ-চৈ, এত হরতাল, এত বোমা, এত হল্লা, কিন্তু তারই পাশাপাশি সিনেমা-থিয়েটার-যাত্রা-গান-বাজনা-রেডিও সবই চলছে। ভৈরববাবু রাস্তায় চলতে চলতে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন। কই, কেউ তো কিছু ভাবছে না। কেউ তো কিছু বলছে না। পাড়ায় যে এতবড় একটা খুন-খারাবি হয়ে গেল, কই, তার জন্যে তো মানুষের জীবন-যাত্রায় কোনও রকম ব্যতিক্রম হয়নি। অথচ এমন ঘটনা রায়পুরে ঘটলে সহরে এতদিনে তোলপাড় সুরু হয়ে যেত।

মিস্টার মহাজন কতবার বলেছেন—চক্রবর্তী, আপনাদের বাংলাদেশই আমাদের সমস্ত ইণ্ডিয়াকে পথ দেখিয়েছে, আপনাদের স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব, আপনাদের শ্রীঅরবিন্দ আর নেতাজী এঁরা সমস্ত ইণ্ডিয়ার গর্ব—

মিস্টার মহাজন মানুষটি ভালো। নইলে অমন করে মন খুলে কেউ বাঙালীদের প্রশংসা করে! বরাবর ভৈরববাবুর গর্ব ছিল তিনি বাঙালী বলে। যখন সুভাষ বোসের মৃত্যু-সংবাদ বেরোল, তার এক বছর পরে বহু লোক তার বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করেছে—চক্রবর্তীবাবু, এ্যাসা শুনা হ্যায় নেতাজী সুভাষ বোস শায়েদ্ জিন্দা হ্যায়?

ভৈরববাবু নিজে একজন বাঙালী বলে কত অবাঙালী তাঁকে

ঈর্ষা করেছে। কিন্তু আজ? আজ যদি মিস্টার মহাজনের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে তিনি কী বলবেন?

ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথাটা গরম হয়ে যায়। একবার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হন দেবসুন্দরবাবুর বাড়িতে।

—কেমন আছেন দেবসুন্দরবাবু?

দেবসুন্দরবাবু প্রথম দিন যেমন ভাবে খাতির-আপ্যায়ন করেছিলেন, তেমন করে পরে আর খাতির-আপ্যায়ন করেন না। তিনি যেন কেমন হয়ে গেছেন। ভালো করে কথাও বলেন না প্রথম দিনের মত।

ভৈরববাবু আবাব জিজ্ঞেস করেন—শরীর কেমন আছে আপনার?

—আর শরীর!

বলে ডান হাতের পাতাটা উল্টে দেন। ওইটুকুতেই যা বোঝবার বুঝে নিতে হবে। যেন ভৈরববাবু চলে গেলেই তিনি খুশী হন। সমবয়সী প্রতিবেশীর সঙ্গে যেটুকু আলাপ-আলোচনা করতে ভালো লাগে তাও করেন না।

ভৈরববাবু আবার জিজ্ঞেস করেন—দিনকাল কেমন দেখছেন?

—আর দিনকাল। আমাদের আবার দিনকাল!

ভৈরববাবুর মনে হয় দেবসুন্দরবাবু যেন আসল উত্তরটা এড়িয়ে যেতে চান।

এর পর আর থাকেন না তিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

বলেন—উঠি—

উঠি তো উঠি। আর একটু বসতেও অনুরোধ করেন না দেবসুন্দরবাবু। ভৈরববাবু নমস্কার করে উঠে বাইরে চলে আসেন। দেবসুন্দরবাবুর ওখানেও যা, হেরম্ববাবুর বাড়িতেও তাই। হেরম্ববাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকেন।

—হেরম্ববাবু আছেন নাকি?

ছেলে এসে বলে—বাবার শরীরটা খারাপ—

—খারাপ? কী হলো? ব্লাড-প্রেসার বাড়লো নাকি?

—হ্যাঁ।

ছোট সংক্ষিপ্ত উত্তর। ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ। নিষ্প্রাণ।

—তাহলে বলে দিও ভৈরববাবু এসেছিলেন—

বলে আবার চলে আসেন রাস্তায়। কী-ই বা করবেন তিনি। কোথায়ই বা যাবেন। যতদিন চাকরি ছিল ততদিন নিজের একটা কাজ ছিল। এখানে কাজ নেই বটে, কিন্তু কথা বলবার লোকও যে নেই। বাড়ির উঠোন পরিষ্কার, রান্না-বান্না করেও যে অনেক-খানি সময় হাতে থাকে। সে সময়টা কী করে কাটে!

প্রভা সকালবেলাই ইস্কুলে চলে যায়। আসে সেই সাড়ে দশটা, এগারোটা, বারোটা। এক-একদিন আরো দেরি হয়ে যায়। সেই সময়টা কী করে কাটে?

মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে বলেন—ওরে প্রভা, জানিস, এ-পাড়ার কোন লোকই আজকাল তেমন ভাল করে কথা বলে না রে আমার সঙ্গে—

প্রভা বলে—তা কেউ কথা না-ই বা বললে, তোমার তাতে কি এসে যায়?

ভৈরববাবু বলেন—তা এসে যায় না? এক পাড়ায় বাস করি, কথা না বলে থাকতে পারি? আর তা ছাড়া পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, পরস্পরের বিপদে-আপদে যদি না-ই দেখলুম তো কিসের প্রতিবেশী? রায়পুরে দেখিসনি তুই, কত লোক আমার বাড়িতে আসতো, আর আমি কত লোকের বাড়িতে যেতুম। তুই তো দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই পরের বাড়িতে থাকতিস—

প্রভা বলে—সে সব কথা ছেড়ে দাও বাবা, সে রায়পুর, আর এ কলকাতা—

ভৈরববাবু বলেন—তা কলকাতা বলে কি আলাদা হতে হবে নাকি? কলকাতায় তো আরো বেশি মেলামেশা হবে, এখানে সবাই তো বাঙালী।

প্রভা বলে—সে সব যুগ চলে গেছে বাবা—

—যুগ চলে গেছে মানে? যুগ চলে গেছে বলে মানুষও বদলে যাবে? তাই কখনও হয়? স্বামী বিবেকানন্দ চলে গেছেন বলে তাঁর কথাগুলোও মিথ্যে হয়ে গেছে—

প্রভা বলে—হ্যাঁ, তা গেছে—

—সে কী রে? তুই বলছিস কী? তুই তো আগে এ-রকম ছিলি না? কলকাতায় এসে তোরও বুঝি এই দশা হলো?

প্রভা বলে—না বাবা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি বলতে চাই ওই বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, নেতাজী, গান্ধী ভাঙিয়ে আর এখন চলবে না। এখন এ-কলকাতার অবস্থাও অন্য রকম, এর চিকিৎসাও তাই অন্য রকম করে করতে হবে—

ভৈরববাবু মেয়ের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান। মেয়ের এ কী-রকম মতিগতি হয়েছে!

বলেন—কিন্তু তুই তো এ-রকম ছিলি না মা আগে। আমি এতদিন কি তোকে এই শিক্ষা দিয়ে এসেছি?

প্রভা এবার হাসে। বলে—তুমি তোমার পক্ষে যা ভালো বুঝেছ সেই শিক্ষাই আমাকে দিয়েছ, কিন্তু আমার পক্ষে যা ভালো বুঝেছি আমি সেই শিক্ষাই নিয়েছি।

—তা আমার শিক্ষা আর তোর শিক্ষা কি আলাদা? ইস্কুলের মেয়েদের তুই এই শিক্ষাই দিস নাকি?

—তা তো দিই!

—তা হলে মহাপুরুষরা এতদিন যা বলে এসেছেন সে সব মিথ্যে? তুই তো মিস্টার মহাজন, আমাদের চেয়ারম্যানকে চিনতিস। তাঁর মুখে শুনিস নি উনিশ শো চল্লিশ সালের দশ'ই মে রাত তিনটের সময়···

—ও গল্প তোমার কাছে অনেকবার শুনেছি বাবা, ও গল্প থাক, তুমি বরং খবরের কাগজ মুখে নিয়ে পড়ো, আমি চলি, আমার কাজ আছে—

বলে প্রভা সেখান থেকে চলে গেল। ভৈরববাবুও আর সেখানে দাঁড়ালেন না। তাঁর মনে হলো তিনি যেন সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। কারোর মতের সঙ্গে তাঁর আর মিলছে না। তিনি নিঃসঙ্গ, তিনি একক।

সেই সন্ধ্যেবেলাই তিনি সেদিন আবার একলা-একলা রাস্তায় বেরোলেন। নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন জীবন! কোথাও কিছু ভালো লাগে না। কেউ তাঁর সঙ্গ পছন্দ করে না। রাস্তাটা বড় নির্জন মনে হলো। কালকেই এখানে এই জায়গাটাতেই একজন পুলিশের কর্তাব্যক্তি খুন হয়েছে। রক্তের দাগ তখনও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। গলির মোড়ের কাছে আসতেই চমকে উঠলেন। একগাদা পুলিশ লাঠি নিয়ে মোড়টা পাহারা দিচ্ছে। তিনি সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি বুড়ো মানুষ আমাকে কে আর কী বলবে!

কিন্তু ও-ফুটপাথে অনেক বাজে লোকের ভিড়। তারা সেখানে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। বাস থেকে ভাড়া না দিয়ে একজন ছোকরা তড়াক করে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লো।

বাস থেকেই বাইরে ঝুঁকে পড়ে কণ্ডাকটার চেঁচিয়ে উঠলো—ও দাদা, টিকিট—

ছেলেটা তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চলন্ত বাসটার দিকে জিভ দেখালো।

—হ্যাঁ মশাই? এত পুলিশ কেন? কী হয়েছে?

কে একজন বলল—খুন হয়েছে—একজন পুলিশ-অফিসার খুন হয়েছে—

—বাঁচা গেছে, বড় জ্বালাচ্ছিল ব্যাটারা—

ভৈরববাবু ছেলেটার দিকে চেয়ে দেখলেন। এ-সব ছোকরাদের সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। কিন্তু ছেলেটার যেন বিকার নেই। সে নিজের মনেই বলে চললো—সব পুড়ে-ঝুড়ে যাক, সব মরে যাক, আবার নতুন করে সব গড়ে উঠবে—

একজন বললে—সবাই মরলে আপনিই কি বাঁচবেন?

ছেলেটা বললে—আমার বেঁচে লাভ কী মশাই? আমাকেও কেউ মেরে ফেলুক না। আমি তো মরতেই চাই—

—তা মরেন না কেন?

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—আমি কেন আগে মরবো? আগে আপনাদের সকলকে মেরে তবে মরবো। সব পুলিশ ব্যাটাকে আগে মার্ডার করবো, সব বড়লোককে আগে মারবো, সঙ্গে সঙ্গে সব বাড়িওয়ালাকেও আগে খুন করবো, তবে মরবো, আমাদের মারা যাবার পরে তবে যদি নতুন করে আবার অন্য সোসাইটি গড়ে ওঠে—

ভৈরববাবু ছেলেটার মুখ থেকে কথাগুলো শুনে অবাক। এই আজকালকার ছেলেদের মতিগতি নাকি? তিনি সকলকে পাশ কাটিয়ে পার্কের ভেতরে ঢুকছিলেন। কিন্তু ওদিক থেকে হঠাৎ একটা বোমা এসে পুলিশদের ওপরে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা ভ্যানে করে একদল পুলিশ এসে হাজির হলো। ভ্যান থেকে নেমেই পুলিশগুলো মারমুখী হয়ে উঠেছে। আর তখন যে যেদিকে পারলে ছুটে পালালো। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম-বাস রিক্‌শা টেম্‌পো প্রাইভেট-কার সব কিছু বানচাল হয়ে গেল।

ভৈরববাবু কী করবেন বুঝতে পারলেন না।

—দাদু!

পেছন ফিরে দেখলেন সেই লম্বা জুলফিওয়ালা ছেলেটা। গায়ে হলদে সার্ট। পরনে টাইট্ প্যান্ট।

বললে—আপনি দাদু, এই সময়ে বেরিয়েছেন কেন? চলে আসুন, চলে আসুন—

বলে তাঁর হাত ধরে পার্কের বাইরে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে। বললে—আপনি আর এখানে দাঁড়াবেন না, বাড়ি চলে যান—

বলে ভৈরববাবুকে রেখে সোজা দৌড়তে লাগলো।

ভৈরববাবু চিনতে পারলেন ছেলেটাকে। এই ছেলেটাই তো! ই ছেলেটাই তো সেদিন পুলিশের লোকটাকে তাঁর বাড়ির সামনে খুন করেছিল! ঠিক এই রকমই চেহারাটা যেন।

ভৈরববাবু তাকালেন—খোকা, খোকা, শোন ভাই শোন, ও খোকা—

কিন্তু ছেলেটা তখন আঁকাবাঁকা গলির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে—

পরের দিনই পুলিশের একটা বড় ভ্যান, আর লাল-সাদা রং-এর জিপ এসে পাড়ায় থামলো। জিপ থেকে নেমে এলেন একজন পুলিশ-অফিসার। মিস্টার ব্যানার্জি। অধীর ব্যানার্জি। নস্কর-বাগান থানার নতুন ও-সি। ডিউটির ভার নিয়েই তাঁকে খুনের ইনভেস্টিগেশন করতে নিজেকে আসতে হয়েছে। লালবাজার হেড-কোয়ার্টার্সের অর্ডার।

পেছনে কয়েকজন পুলিশ কনেস্টবলও ভ্যান থেকে নামলো। বড় সিরিয়াস চার্জ পাড়ার লোক্যাল বয়েজদের বিরুদ্ধে। দিল্লি থেকেও সরাসরি ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে কথা হচ্ছে হোম-ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির সঙ্গে। গুণ্ডাবাজি যেমন করে হোক বন্ধ করতেই হবে। দরকার হলে গুলি চালাও। আর্মি ডাকো, সি-আর-পি ডাকো।

মিস্টার অধীর ব্যানার্জি মধ্যবিত্ত-ঘরের ছেলে। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। পরের গলগ্রহ হয়ে দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তারপর ছোটবেলায় প্রাইভেট টিউশ্যানি করে চালিয়েছে। তারপর একদিন জন্মভূমি পাকিস্থান হয়ে গেল হঠাৎ। কলকাতায় এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে কাজ করে মানুষ হয়েছে। বিধবা মা সে-বাড়ির রাঁধুনি-বৃত্তি করেছে আর ছেলে হন্যে হয়ে পরের দরজায় ঘুরে ঘুরে চাকরির চেষ্টা করেছে।

শেষকালে এই পুলিশের চাকরিটা কোনও রকমে জোগাড করতে পেরেছিল অধীর ব্যানার্জি।

মা'র চাকরিটা ভালো লাগেনি।

মা বলেছিল—হ্যাঁ রে, শেষকালে পুলিশের চাকরি পেলি? আর কোন অন্য চাকরি জোগাড় করতে পারলি না—

অধীর বললে—চাকরির যা বাজার, এই-ই নিতে হলো মা—

মা ভেবেছেন বুঝি ছেলে তার ইংরেজ আমলের পুলিশের চাকরি পেয়েছে। ইংরেজ-আমলে পুলিশকে লোকে যত ঘেন্না করতো, আবার তেমনি খাতিরও করতো। কিন্তু স্বদেশী আমলে খাতির চলে গেছে, আছে শুধু ঘেন্না। এখন রামেও পুলিশকে মারে, আবার রাবণেও। আজ যে খুনের আসামী, কালই হয় সে আবার হোম-মিনিস্টার। সুতরাং বুঝে-শুনে পুলিশকে কাজ করতে হয়। ডিউটি না করলেও আজকাল প্রমোশন হয়। শুধু হিসেব রাখতে হবে কোন পার্টি মিনিস্ট্রি পাবে। সেই হিসেব রেখে সেই পার্টিকে তোয়াজ করে যাও। যখন তারা গদিতে বসবে তখন তোমার প্রমোশন কে আটকায়?

যা'হোক, এবার যখন নস্কর-বাগান থানায় বদলি হলো অধীর, তখন তার একটু ভাবনা হলো। আগের ও-সি খুন হয়ে গেছে। তারই ভেকেন্সিতে গিয়ে ডিউটি করতে হবে। আগেকার মত তেজ আর নেই অধীরের। তেজ ছিল খানিকটা আগেকার আমলে। তখন জানতো একটা পার্টিই মনিব। সেই একটা পার্টিকে তোয়াজ করে গেলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। বড় কর্তা থেকে শুরু করে চুনো-পুঁটি পর্যন্ত সকলকে তখন তোয়াজ করে গেছে সে! তার ফলে প্রমোশন হয়েছে, মাইনে বেড়েছে। তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু কথা বলতে সাহস পায়নি।

কিন্তু এইবার হয়েছে মুশকিল। এখন হাজারটা পার্টি, হাজারটা কর্তা, হাজারটা মনিব। একটা ছোট্ট পুঁচকে পার্টির মেম্বারও চোখ রাঙায়। বলে—আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার ইলেকশানে আমাদের পার্টি মিনিস্ট্রি পেলে আপনাকে দেখে নেব।

অনেকে আবার শাসায়। বলে—জানেন আমি কোন্ পার্টির মেম্বার?

এর চেয়ে ইংরেজ-আমল ঢের ভালো ছিল। যারা পুরোন স্টাফ তারা তাই বলে।

তারা বলে—সে-যুগে জাস্টিস ছিল হে। ন্যায়-বিচার ছিল। এখন স্বদেশী হয়ে আমাদের কচু হয়েছে, কাঁচকলা হয়েছে—

কিন্তু সে যা-ই হোক, পাকে-প্রকারে ভয়ে-ভক্তিতে খোসামোদে-তোয়াজে যেমন করেই পারে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। মিনিস্টার বছরে-বছরে কিংবা মাসে-মাসে হপ্তায় হপ্তায় বদলাক। তা বলে পুলিশ অত ঘন ঘন তো বদলাতে পারে না। তারা বহাল-তবিয়তে থাকে। তফাতের মধ্যে শুধু এই যে, মিনিস্টারের পেয়ারের লোক হলে ভালো-ভালো থানায় বদলি হবে। নইলে পাঠিয়ে দেবে বেলেঘাটায়, নয় তো মানিকতলায়, নয় তো কসবা কিংবা বরানগরে।

এবার অধীর ব্যানার্জির ট্র্যানসফার অর্ডার হয়েছে নস্কর-বাগানে। প্রথম দিনে ডিউটিতে এসেই লালবাজারের হুকুমে পাড়ায় আসতে হয়েছে। পাড়ার লোকদের সরেজমিনে তদন্ত করে বলতে হবে কে আসল খুনী!

প্রথমেই বারো নম্বর বাড়ি। যে-বাড়ির সামনে খুনটা হয়েছিল।

কড়া নাড়তেই দরজাটা খুলে গেল। বাড়ির একজন ঝি দরজা খুলে পুলিশ দেখেই মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে।

—বাড়িতে কে আছেন? বলো নস্কর-বাগান থানার ও-সি এসেছে।

পুলিশ এসেছে! শুনেই যেন একটা ভয় সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রীতে শিউরে উঠলো।

করুণাকান্তবাবু পুলিশের নাম শুনেই যেন থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন। কেন পুলিশ এল? তিনি কী করেছেন? কথাটা করুণাকান্তবাবুর স্ত্রীও শুনেছিলেন ঝি-এর মুখ থেকে। শুনেই কর্তার কাছে এলেন। বললেন—হ্যাঁ গো, পুলিশ এল কেন?

করুণাকান্তবাবু বললেন—আমিও তো তাই ভাবছি—

গৃহিণী বললেন—তুমি যেন বাপু আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলো না পুলিশের কাছে।

করুণাকান্তবাবু বললেন—তা হলে আমাদের ঝি-কেই পাঠাও

না, জিজ্ঞেস করে আসুক কী দরকার!

—ওমা, তুমি বলছো কী? পুরুষমানুষ বাড়িতে থাকতে ঝি যাবে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে?

—তাহলে কী বলবো বলো তো?

—তুমি কী বলবে তা মেয়েমানুষ হয়ে আমি কী করে বলবো?

—যদি জিজ্ঞেস করে কে খুন করেছে, আমি দেখেছি কি না?

গৃহিণী বললেন—তুমি বলবে তুমি দেখনি, এ তো সোজা কথা—আর দেরি কোর না, তুমি যাও, অনেকক্ষণ ধরে পুলিশ বসে আছে, কী ভাববে বলো দিকিনি?

করুণাকান্তবাবু আর দেরি করলেন না। নিচেয় নেমে এসে বললেন—কী দরকার আমাকে?

অধীর ব্যানার্জি বললে—আমরা থানা থেকে এসেছি এনকোয়ারী করতে। এ-পাড়ায় এখানকার থানার ও-সি খুন হয়ে গেছে, আপনি শুনেছেন তো?

করুণাকান্তববাবু কী উত্তর দেবেন প্রথমে বুঝতে পারলেন না। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, লোকের মুখে আমি শুনেছি—

—আপনি নিজে দেখেননি?

করুণাকান্তবাবু বললেন—না—

—কেন? আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

—আমার কি একটা কাজ? তখন কোথায় ছিলুম আমার কি মনে আছে। আমার তো স্টেশনারি দোকান আছে বড়বাজারে। সেখানেও মাঝে-মাঝে যাই, তারপর তাগাদাতেও যাই ব্যাপারিদের কাছে—

—আপনার ছেলে আছে?

—হ্যাঁ—আছে বৈকি। তারা কেউ এ-বাড়িতে থাকে না। তাদের দু'জনের দুটো বাড়ি করে দিয়েছি। তারা সাবালক হয়েছে। তারাই বেশির ভাগ সময়ে দোকান দেখে। আমি বুড়ো হয়েছি,

সব সময়ে আমি দোকানে যেতে পারি না।

দারোগাবাবু কথাগুলো সব লিখে নিতে লাগলেন।

—আপনার এ-বাড়িতে পুরুষমানুষ আর কেউ আছে?

—আজ্ঞে না, আমি, আমার স্ত্রী, আর একজন ঝি বাড়ির কাজকর্ম করে।

—আপনার বাড়িতে শুনেছি একজন ভাড়াটে থাকে।

—হ্যাঁ, এই সামনে গলি দিয়ে ভেতরে চলে যান। গিয়ে দরজার কড়া নাড়ুন। একজন মেয়ে থাকে, সে ইস্কুলের মাস্টারনী।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তিনি কি ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলেন?

—তা বলতে পারবো না মশাই। আমি ছা-পোষা মানুষ, হাজারটা ঝামেলা আমার। সব দিকে কি নজর দেবার সময় আছে আমার?

দারোগাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গের কনেস্টবলরা পেছন-পেছন চলতে লাগলো।

পাশের গলি দিয়ে ঢুকে সোজা এগোলেই একটা দরজা। দরজার সামনে তালা ঝুলছিল একটা। বোঝা গেল বাড়িতে কেউ নেই।

এবার অন্য বাড়িতে যেতে হবে। যে-জায়গাটায় খুনটা হয়েছিল তার আশেপাশের বাড়িগুলোর এভিডেন্স নিলেই চলবে।

করুণাকান্তবাবু দোতলায় গিয়ে জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখলেন পুলিশ ভাড়াটেদের বাড়ির গলির মধ্যে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল। তাহলে বোধহয় মেয়েটা বাড়ি নেই। কিন্তু তার বুড়ো বাপ? বাপটা আবার কোথায় গেল? সেও কি বেরিয়েছে নাকি?

তারপর দেখলেন পুলিশের দল হেরম্ববাবুর বাড়ির সদর-দরজার কড়া নাড়ছে।

তাড়াতাড়ি করুণাকান্তবাবু স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

—ওগো, শুনছো, এইবার বুড়ো মুশকিলে পড়বে।

—কে? কোন্ বুড়ো? কার কথা বলছো?

—ওই ব্লাড-প্রেসারের রুগী, হেরম্ববাবুর বাড়িতে গেছে পুলিশ। এবার বুঝুক ঠ্যালা। আমাকে বড় বলছিল আমি অমন ভাড়াটে রেখেছি কেন? সবাই দেখেছে, কিন্তু কেউ বলতে সাহস করবে না। আমাকে বলে কিনা আপনি থানায় গিয়ে ডায়েরি করে আসুন। এখন বুঝুন ঠ্যালা কাকে বলে। পরকে অমন উপদেশ সবাই দিতে পারে—

গৃহিণী তখন কাজ করতে ব্যস্ত। বেশি কথার উত্তর দেবার তখন সময় নেই তাঁর। তিনি রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন—আমার রান্না পুড়ে গেল, যাই—

কিন্তু গৃহিণীর আগ্রহ থাক আব না-থাক, করুণাকান্তবাবু কিন্তু স্থিব থাকতে পাবলেন না। আবার জানালার ধারে ছুটে গেলেন। গিয়ে খড়খড়িটার ফাঁকে চোখ রেখে হেরম্ববাবুর বাড়ির দিকে চেয়ে বইলেন। পুলিশেব দলকে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। তারা হেরম্ববাবুর বৈঠকখানার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। করুণাকান্তবাবু পাশের জানালার ফাঁক দিয়েও দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তবু কিছুতেই ভেতরে নজর গেল না।

নস্কর-বাগান ছেলেদের ক্লাবে তখন পুলিশের তালা-চাবি পড়ে গিয়েছিল। তার আগেই সমর ক্লাবের খাতাপত্র সব নষ্ট করে ফেলে দিয়েছে। শুধু ফেলে দিয়েছে নয়, তারা কোথায় আত্মগোপন করে আছে কেউ জানে না। কিন্তু বোমা ফাটার বিরাম নেই কলকাতায়। লোকে রাত্রে ঘুমিয়ে থাকবার সময় হঠাৎ হয়ত একটা বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করবার চেষ্টা করে শব্দটাকে। শব্দই যেন সত্যি, আর সব মিথ্যে। কলকাতার জীবন আপন নিয়মে চলতে গিয়ে হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্যে থেমে যায়। অন্ধকার ঘিরে ফেলে সমস্ত অঞ্চলটাকে। আশেপাশের সবাই প্রাণ-ভয়ে ছুটে পালায়। খানিকটা ধোঁয়া ওঠে। তারপর পুলিশ যখন এসে পৌঁছায় তখন সব স্বাভাবিক। আবার ট্রাম চলতে শুরু করেছে। বাসও চলেছে মানুষের পাহাড় কাঁধে নিয়ে।

সেদিন ইনভেস্টিগেশনটা শেষ হলো না। বারো নম্বর বাড়ির পর পুলিশ হেরম্ববাবুর বাড়িতে গেল। কিন্তু সেখানেও ওই একই উত্তর।

হেরম্ববাবু বললেন—ব্লাড-প্রেসারের রুগী মশাই আমি, আমি কি অতসব ঝামেলার মধ্যে যাই? লোকে আমার গালে একটা চড় মেরে গেলেও আমার কিছু বলবার ক্ষমতা নেই। ডাক্তার আমাকে পই-পই করে বারণ করে গিয়েছে আমি যেন কোনও রকম উত্তেজনার মধ্যে না যাই—

—তা বলে আপনার বাড়ির সামনে একজন মানুষ খুন হলো আর আপনি কিছুই জানতে পারলেন না?

হেরম্ববাবু বললেন—ওই যে বললুম, আমার মাথার কাছে বোমা ফাটলেও আমার কিছু করবার নেই। আমি কাউকে জিজ্ঞেস করতেও

পারবো না যে, কে বোমাটা ফাটালে। এ বড় নচ্ছার রোগ মশাই। এ-রোগ যার হয়েছে সে-ই কেবল বুঝতে পারবে আমার কষ্টটা—

—আপনার ছেলেরা? ছেলে আছে তো আপনার?

হেরম্ববাবু বললেন—তাদের কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। তারা কারো সাতে-পাঁচে নেই। তাদের একজন অফিসে যায় আর বাড়ি আসে, আর একজন কলেজে পড়ে। তা কলেজে তো আজকাল পড়াশোনা ঘুচে গেছে। দেখে আসুন এখন হয়ত ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে সে পড়াশুনোয় ডুবে আছে—

—আর মেয়ে? মেয়ে নেই আপনার?

হেরম্ববাবুর মুখ এবার প্রসন্ন হয়ে উঠলো। বললেন—ও-ব্যাপারে আমার ভাগ্য ভালো বলতে পারেন মশাই। দুটো মেয়ে, দুটো মেয়েরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে, আমি বেঁচেছি। সেদিক থেকে ভগবানের আশীর্বাদে আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

অধীর ব্যানার্জি সব কথা নোট বইতে টুকে নিচ্ছিল। কিন্তু আর কী প্রশ্ন জিজ্ঞেস কববে বুঝতে পারলে না। নোট-খাতাটা বন্ধ করে পকেটে রেখে উঠলো।

বললে—আপনাকে একটু ট্রাবল দিলুম বলে কিছু মনে কববেন না। এটা তো আমাদের ডিউটি!

হেরম্ববাবু বললেন—হাজার বার ডিউটি। ডিউটি বলে ডিউটি। আপনারা ডিউটি করছেন বলে তবু আমরা শান্তিতে একটু ঘুমোতে পারছি মশাই—আপনারাই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন এ-যাত্রায়। নইলে আমি ব্লাড-প্রেসারের রুগী কবে খতম হয়ে যেতুম—

অধীর ব্যানার্জি এবার অন্য পথ ধরলো।

বললে—কিন্তু ছেলেরা আমাদের ডিউটি করতে দিচ্ছে কই, বলুন? আমাদের ডিপার্টমেণ্টের কত লোক ডিউটি করতে গিয়ে খুন হয়েছে, তা জানেন?

—তা আর জানি না? খবরের কাগজেই তো রোজ পড়ছি।

—খবরের কাগজে পড়তে হবে কেন? আপনার বাড়ির সামনেই

তো সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। অথচ দেখুন, তিনিও তো ডিউটি করছিলেন। তাঁরও তো ফ্যামিলি আছে, ছেলেমেয়ে আছে। তার প্রাণেরও তো দাম আছে। তিনি তো কোনও অপরাধই করেননি। প্লেন ড্রেসে ডিউটি দিচ্ছিলেন, যাতে আপনাদের মত শান্তিপ্রিয় লোকরা নির্বিঘ্নে দিন কাটাতে পারেন—

হেরম্ববাবু বললেন—হাজার বার, হাজার বার—

—তাহলে একটা অন্ততঃ উপকার করুন আমাদের।

—বলুন, আপনাদের আমি কী উপকার করতে পারি? আমি সামান্য লোক…

—সামান্য লোক হলেও আপনি তো এ-পাড়ার পুরোন বাসিন্দা. এ-পাড়ার কোন্ কোন্ ছেলে বদমাইস, সেটাও যদি আমাদের বলে দেন তো আমাদের মহা উপকার করা হয়। শুধু আমাদের উপকার কেন, দেশেরও উপকার করা হয়। আমাদের নিজেদের চেয়ে তো দেশ বড়। সেই দেশের উপকারের জন্যেও তো আমাদের সাহায্য করা উচিত আপনাদের। আপনার মত বিবেচক লোকদেরই তো এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত। হয় আমাকে বলুন, আর যদি প্রাণের ভয় থাকে তো লালবাজারে ডাইরেক্ট টেলিফোন করে তাদের সকলের নাম জানিয়ে দিন। জানিয়ে দিন, কাদের আপনি সন্দেহ করেন। দেখবেন আপনারা পাড়ার বিবেচক লোকরা যদি একটু কষ্ট করেন তো আজই আমরা কলকাতার শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারি—

বলে অধীর ব্যানার্জি একটু থামলো। থেমে হেরম্ববাবুর মুখের দিকে চেয়ে উত্তরের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

হেরম্ববাবু বললেন—আমি তো খবর দিতে পারতুম স্যার। তাতে তো আমাদেরই ভালো হতো। কিন্তু আমি যে ব্লাড-প্রেসারের রুগী, পাড়ার কোনও ব্যাপারে খবর রাখাও যে আমার নিষেধ—

—কিন্তু আপনার ছেলেদের তো আর ব্লাড-প্রেসার নেই, তাদের কাছেও তো খবর নিয়ে আমাদের জানাতে পারেন—

—তাহলেই হয়েছে। তারা আবার আমার চেয়েও আনাড়ী স্যার। এ-যুগের পক্ষে একেবারে অচল। আমি তো ছেলেদের তাই বলি—তোরা কোনও কম্মের নয়, একেবারে অকম্মা।

এর পর আর দাঁড়ালো না অধীর ব্যানার্জি—নস্কর-বাগান থানার ও-সি। আস্তে আস্তে সদল-বলে বেরিয়ে এল।

রাত্রে ছেলেরা বাড়ি এলে হেরম্ববাবু সব ঘটনা তাদের বললেন।

তারপর বললেন—ঠিক বলিনি ?

হেরম্ববাবুর স্ত্রী বললেন—তুমি আর বাহাদুরি কোর না, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলুম তাই বেঁচে গেলে, নইলে কী হতো ভগ্‌মান জানে—

ভবেশ বললে—তা তুমি ওদের বারো নম্বরের ভাড়াটেদের বাড়িতে যেতে বললে না কেন ?

হেরম্ববাবুর স্ত্রী বললেন—না না, ওসব বলতে যাওয়াই খারাপ। শেষকালে কী বলতে গিয়ে কী হয়ে যাবে, পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা, ওর মধ্যে যেতে আছে ?

হেরম্ববাবুর স্ত্রীর যা মত, এই নস্কর-বাগান লেনের সমস্ত বাসিন্দারই ওই একমত। দেখা গেল, যেন কেউই খুন করার ঘটনাটা দেখেনি। কেউ শোনেওনি। দিন-দুপুরে খোলা আকাশের তলায়, সকলের বাড়ির এক-পা পেরোলেই যে-ঘটনা ঘটে গেল তা আশ্চর্য-জনকভাবে সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

অধীর ব্যানার্জি অবাক হয়ে সেদিন সদল-বলে থানায় ফিরে গেল। কিন্তু ফিরতে গিয়েই একটা কনেস্টবল বললে—হুঁজুর, ওই যে সেই দিদিমণি আসছে—

অধীর ব্যানার্জি বললে—কোন্ দিদিমণি ?

—হুঁজুর, সেই বারো নম্বর বাড়ির ভাড়াটে।

এবার অধীর ব্যানার্জি ভালো করে তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখলে। মাথায় ছাতা, পরনে একটা ছাপা শাড়ি। মোটামুটি গোলগাল চেহারা। কিন্তু জৌলুস আছে চেহারায়। দেখলেই বোঝা যায়

মনের তেজ অফুরন্ত। সামনে আসতেই অধীর ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলে—আপনার নামই কি মিস্ প্রভা চক্রবর্তী ?

প্রভা দাঁড়িয়ে গেল। বললে—হ্যাঁ—

—আমি এই নস্কর-বাগান থানার ও-সি। এ-পাড়ায় আপনার বাড়ির সামনে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল তা জানেন ?

—হ্যাঁ, আমি শুনলুম।

—আপনি নিজের চোখে দেখেননি ?

—না, আমি তখন সংসারের কাজকর্ম করছিলুম।

—কিন্তু যখন পাড়ার সব লোক হৈ-চৈ করে উঠলো, আপনি তাদের চিৎকারের শব্দও শুনতে পাননি ?

প্রভা বললে—চিৎকারের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। কিন্তু ও-রকম চিৎকার তো আজকাল পাড়াতে সব সময়েই হচ্ছে, তাই ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি।

—তাহলে এ সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না ?

—না।

—কে মারা গেছে তা শুনেছেন তো ?

—হ্যাঁ, ইস্কুলে সবাই বলছিল।

অধীর ব্যানার্জি এবার বললে—কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি বলতে পারেন কাকে আপনার সন্দেহ হয় ?

প্রভা বললে—কাকে আমার সন্দেহ হবে বলুন ? আমি তো পাড়ার কাউকেই চিনি না। আমি এখানে কয়েক বছর আছি বটে, কিন্তু কারোর সঙ্গেই আমার মেলামেশার সুযোগ হয়নি। আমি ইস্কুলে যাই আর আসি। তারপরে যেটুকু সময় পাই তখন রান্না-বান্না সেলাই-ফোঁড়াই আর ছাত্রীদের খাতা দেখতেই দিন কেটে যায়—

—তাহলে আপনি কোনও সাহায্যই আমাদের করতে পারলেন না ?

—না।

—আচ্ছা নমস্কার।

কোথায় যেন আকাশের কোন্ কোণে এক টুকরো কালো মেঘ ছিল, কেউ দেখতে পায়নি আগে। বেশ সুখে-সচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত হয়েই সবাই ঘরকন্না করছিল। সকালবেলা সবাই অফিস-কাছারি গেছে। দুপুরে অফিসের কাজের নামে ক্যানটিনে গিয়ে পলিটিকস আলোচনা করেছে। কাজের কাজ যদি কিছু করে থাকে তো সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন। ইউনিয়নের জন্যে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি, মিছিল, শ্লোগান। আর মাসে দুটো তিনটে করে শহীদ মিনারে মিটিং। লীডারদের গরম-গরম লেকচার শুনে সবাই গা-গরম করেছে। এ-ছাড়া যাদের অফিস-কাছারি-স্কুল কিছু নেই, তারা সিনেমা দেখেছে, থিয়েটার দেখেছে বা কালচারাল কাজের নামে দল বেঁধে মেয়েমানুষ নিয়ে থিয়েটার করেছে।

এই তো ছিল বাঙালী জীবনের ধরা-বাঁধা রুটিন।

এর ক্বচিৎ-কদাচিৎ ব্যতিক্রম যখন হয়েছে তখন দু-চারখানা স্টেট বাস বা ট্রাম পুড়েছে। তাতে ভেবেছি লোকসান যা-কিছু হয়েছে তা সবই গভর্মেন্টের। আমাদের ষোল আনাই লাভ!

কিন্তু এবার অন্য রকম।

এবার বলা-নেই কওয়া-নেই, হঠাৎ কারা এসে কোথায় হামলা করে। আর পুলিশ আসবার আগেই পালিয়ে যায়।

স্কুলে লেখাপড়া চলছে, হেডমাস্টার অফিস-ঘরে বসে কাজকর্ম করছেন। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, বোমার শব্দ। তারপর কাগজ-ফাইল-ম্যাপ সব কিছু তছনছ। টেলিফোন-রিসিভার চেয়ার-টেবিল সব কিছু ভেঙেচুরে একশা। শুধু তাই নয়, অফিস-আদালত-কাছারি ফ্যাক্টরি সব কিছু অচল খানিকক্ষণের জন্যে!

এ কারা? এদের দলের নাম কী? এরা কী চায়? এত বোমাই বা এরা পায় কোত্থেকে?

সহজবুদ্ধি মানুষ, বুদ্ধিজীবী, কেরানী, মুটে, মজুর, শিক্ষক; সবাই সবাইকে প্রশ্ন করে—এ কারা মশাই? এদের দলের নাম কী? এরা কী চায়? এত বোমাই বা এরা পায় কোত্থেকে?

ভৈরববাবুও সবাইকে জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁ মশাই, এরা কারা?

প্রভাকেও জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁ মা, এরা কারা তুই কিছু জানিস?

প্রভা বলে—তুমি চুপ করে থাকো না বাবা! তোমার গায়ে তো বোমা লাগছে না, তোমার ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী?

আজকাল প্রভা ইস্কুলে বেরিয়ে গেলেই ভৈরববাবু দু-চারটে কাজকর্ম সেরে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়েন। দেবসুন্দরবাবু বাড়িতে থাকলে তাঁর সঙ্গেই খানিক কথা বলেন। কিন্তু তিনি ভৈরববাবুকে আর সেই আগেকার মতন আমল দেন না।

ভৈরববাবু জিজ্ঞেস করেন—আচ্ছা মশাই, এরা কারা?

দেবসুন্দরবাবু কথাটা এড়িয়ে যান। বলেন—আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞেস করবেন, তারা আজকালকার ছেলেমেয়ে, তারাই ভালো জানে—

ভৈরববাবু বলেন—তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম মশাই, সে বলে—তুমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না। আচ্ছা আপনিই বলুন, আমিও তো সমাজের একজন, আমি মাথা না ঘামিয়ে থাকতে পারি? জানেন, সেদিন ট্রামে চড়েছি, টিকিট-চেকার টিকিট চাইতে এল, একজন ছেলে টিকিট কাটলে না। বললে—পার্টির লোক—

—তারপর?

—তারপর আর কী, কথা-কাটাকাটি, গালাগালি, হাতাহাতি, মারামারি।

—শেষ পর্যন্ত কী হলো?

—পাড়ার ছেলেরা কোত্থেকে এসে জুটলো আর ট্রামটা পুড়িয়ে দিলে। আমরা সব বারণ করতে গেলাম, আমাকে মারতে এল লোহার রড নিয়ে মশাই।

দেবসুন্দরবাবু হাসতে লাগলেন মিটিমিটি, যেন কথাটা শুনে বেশ মজা পেয়েছেন।

ভৈরববাবু জিজ্ঞেস করলেন—আপনি হাসছেন যে?

—হাসছি আপনার কাণ্ড দেখে। আপনি এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আপনার কীসের দায়? আপনার মেয়ে চাকরি করছে, উপায় করছে, রান্নাবান্না করছে, আপনি খান আর আরাম করুন। যেমন সবাই করছে। আপনি কাউকে দেখেছেন এ নিয়ে ভাবতে? তারাই ভালো আছে। আপনিই বলুন না, ভেবে কিছু লাভ আছে? ভাবলেই মন-খারাপ আর মন-খারাপ হলেই স্বাস্থ্য-খারাপ!

ভৈরববাবুর মনেও যেন একটু দ্বিধা হয়।

বল্লেন—তাহলে আপনিও বলছেন ভাববো না?

—না, কিছ্ছু ভাববেন না। এই যে আমার নতুন রং-করা বাড়ির দেয়ালে মোটামোটা অক্ষরে আলকাতরা দিয়ে কারা কী-সব ছাই-পাঁশ লিখে গেল, আমি কি তা নিয়ে ভাবছি?

তা বটে! ট্রাম পুড়ছে, স্কুল পুড়ছে, বোমা ফাটছে, লোক মরছে, বাড়ির সামনেই একজন লোক খুন হলো। কই, তা নিয়ে তো কেউ কিছু মাথা ঘামাচ্ছে না—

দেবসুন্দরবাবু উদাহরণ দিলেন একটা।

বললেন—এই তো সেদিন আমি জানালার ধারে বসে বসে খবরের কাগজ মুখে দিয়ে তামাক খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কিনা একজন ছোকরা একজন লোককে খুন করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। একেবারে আমার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটে গেল মশাই। তারপর শুনলুম লোকটা নাকি আমাদের এখানকার থানার ও-সি। তা ও-সি তো ও-সি। আমারই বা কী আর কারই বা কী? তা পরশুদিন

এখানকার থানার নতুন ও-সি এসেছিল আমার বাড়িতে। আমায় জিজ্ঞেস করছিল—কে খুন করেছে আমি দেখেছি কি না—

—তা আপনি কী বললেন?

—আমি আর কী বলবো? আমি বললুম—আমি কিছুই দেখিনি। আমি তখন ঘুমোচ্ছিলুম।

—তারপর?

—তারপর আর কী? তারপর তারা চলে গেল। আমি কি অত বোকা মশাই? আমি বলি—হ্যাঁ আমি দেখেছি, আর তারপর আমার হয়রানি হোক! সে হয়রানির হাত থেকে পুলিশ আমায় বাঁচাবে? আর তারপর যদি ছেলে-ছোকরারা রেগে গিয়ে আমার বাড়িতে বোমা চার্জ করে? বাড়ির ভেতরে ঢুকে আমায় খুন করে? তখন আর আঠারো ঘাতে কুলোবে না, একেবারে বাহাত্তর ঘা দিয়েও রেহাই দেবে না—

কথাটা ভৈরববাবুর ভালো লাগেনি।

বললেন—আপনার নিজের স্বার্থটাই বড় হলো দেবসুন্দরবাবু? আর একজন মানুষের জীবন কিছুছু নয়? কত প্রাণ বলি দিতে হয়েছে বলুন তো এই স্বাধীনতার জন্যে! এই যে আমরা স্বাধীনতা ভোগ করছি এ কাদের জন্যে বলুন তো? গান্ধী, নেহরু আর প্যাটেলের জন্যে তো আর নয়, এ সেই তাদেরই জন্যে যারা পুলিশের গুলীতে জীবন দিয়েছে। তারা জীবন না দিলে কি ইংরেজ-ব্যাটারা এ-দেশ ছেড়ে চলে যেত ভেবেছেন?

এ-সব কথা সকলের সঙ্গেই বলেন ভৈরববাবু।

—আর হল্যাণ্ডের কথা জানেন? উনিশ শো চল্লিশ সালের দশ'ই মে রাত তিনটের···

তা সেদিন হেরম্ববাবুর সঙ্গে বাড়ির সামনেই দেখা হয়ে গেল দেবসুন্দরবাবুর।

হেরম্ববাবু বললেন—ভৈরববাবুর সঙ্গে দেখা হলো। বুঝলেন—। একটা আস্ত পাগল মশাই। একেবারে আস্ত পাগল।

—কেন ?

হেরম্ববাবু বললেন—কেবল বলেন আপনারা কিছু ভাবছেন না, দেশ যে রসাতলে গেল। এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি ভৈরববাবুকে নিয়ে। আপনার কাছেও আসবেন, দেখবেন—

—এসেছিলেন।

—এসেছিলেন ? তাহলে তো সবই শুনেছেন আপনি। ওই যেখানে যাকে পাচ্ছেন তাকেই ধরে লেকচার দিচ্ছেন। বলছেন দেশ রসাতলে গেল, আপনারা কিছু করছেন না। আরে মশাই, আমরা কী করবো ? দেশে গভর্মেণ্ট রয়েছে, মিনিস্টার রয়েছে, লাটসাহেব রয়েছে, সৈন্য-সামন্ত রয়েছে, আমরা কী করবো শুনি ? আমরা তো গেরস্থ মানুষ! তা আপনার কাছে হল্যাণ্ডের গল্প করেননি ? উনিশ শো চল্লিশ সালে দশ'ই মে হিটলার যেদিন রাত তিনটের সময়··

দেবসুন্দরবাবু হাসতে লাগলেন—করেননি আবার! হল্যাণ্ডের সেই গল্প শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে মশাই একেবারে। মানুষটার নিশ্চয় মাথায় গোলমাল আছে—

কথাগুলো মিথ্যে নয়। হয়ত পার্কের মধ্যেই অচেনা সব ভদ্রলোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেকচার শুরু করে দেন।

বলেন—আমি মশাই মরতে বসেছি। আমার আর বেশি দিন নয়। আমি থাকলেও যা, না-থাকলেও তাই। কিন্তু আপনারা ভাই আমার চেয়ে বয়েসে ছোট। আপনারা অনেক দিন বাঁচবেন এখনও। আপনারা গভর্মেণ্টের ভরসায় বসে থাকবেন না। আমাদের দেশে হাজারটা পার্টি আর তিন হাজারটা লীডার। তারা কেউ দেশের ভালো চায় না, তারা নিজের কোলে ঝোল টানতেই ব্যস্ত সবাই—

কে একজন এক কোণ থেকে ফুট্ কাটলো—বুড়োটা পাগল রে, আস্ত পাগল—

মন্তব্যটা কানে গেল ভৈরববাবুর।

সেই দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে লাগলেন—হ্যাঁ বাবা, আমি পাগলই বটে, একটা আস্ত পাগল। নইলে আরাম করে বাড়িতে না ঘুমিয়ে এখানে এসে বকর-বকর করি? আমি পাগলই। তোমরা ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমার মত যদি আরো কিছু পাগল থাকতো তো এ-দেশের চেহারা আজ অন্যরকম হয়ে যেত।—

একপাশ থেকে একটা চিৎকার উঠলো—থামুন আপনি—

ভৈরববাবু গলা চড়ালেন—থামবো কেন? দেখছেন মশাই, আমাকে থামতে বলছে। কেন থামবো? আমার কথা আমি না বললে কে বলবে? আমাদের মত গরীব লোকের কথা বলবার জন্যে কে আছে? পার্টি-লীডাররা? তারা তো সবাই স্বার্থপর। তারা কথায় কথায় হরতাল ডাকে। কেন হরতাল ডাকবে? কার স্বার্থে? আমাদের, না তাদের নিজেদের স্বার্থে? তাতে কার ক্ষতি হয়েছে? আমাদের না তাদের? আপনারা জেনে রাখবেন আমাদের জনসাধারণের যত ক্ষতি হবে, লীডারদের ততই লাভ! তাই কথায় কথায় আমাদের দেশে হরতাল হয়, কথায় কথায় ধর্মঘট—

এবার হঠাৎ একটা ঢিল এসে পড়লো সামনে।

কিন্তু তাতে ভয় নেই ভৈরববাবুর। তিনি আরো গলা চড়িয়ে লেক্‌চার দিতে লাগলেন।

কিন্তু ঢিল পড়া দেখে দু'চারজন যারা প্রবীণ লোক ছিল, তারা সরে পড়তে লাগল। তবে অনেকেই রইল তখন। তাদের বেশ মজা লাগছিল। বুড়ো লোকটাকে নিয়ে তাদের বড় মজা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

তারা বললে—আপনি বলুন মশাই, বলুন। আমাদের ভালো লাগছে শুনতে—

ভৈরববাবু তখন আরো উৎসাহ পেয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন—আপনারা আমার কথায় মজা পাচ্ছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু এ মজার কথা নয়। আমি মধ্যপ্রদেশে ছিলুম। সেখানে আরামেই ছিলুম। কিন্তু রিটায়ার করে নিজের জন্মভূমিতে এসে শেষ ক'টা দিন

কাটাতে চেয়েছিলুম। ভাববেন না আমার কোনও যাবার জায়গা নেই। আমি ইচ্ছে করলেই আবার সেখানে গিয়ে আরামে থাকতে পারি। থাকবার মত আমার সামর্থ্যও আছে, আমি এখনও মাসে দেড়শো টাকার মতন পেনশন পাই। কিন্তু তা আমি চাই না। আমি বাঙ্গালী, বাঁচলে বাঙ্গালীদের সঙ্গেই আমি বাঁচতে চাই, মরলে বাঙ্গালীদের সঙ্গেই আমি মরতে চাই—তাই আপনাদের বলছি, আপনারা এখন সচেতন হোন। যেখানে দেখবেন বাস-ট্রাম পুড়ছে সেখানেই বাধা দিন, যেখানে বোমা ফাটছে সেখানেই এগিয়ে গিয়ে তাদের ধরুন, পুলিশের কাছে জানাশোনা গুণ্ডাদের নাম বলে দিন—সমস্যা আমাদের হাজারটা নয়, সমস্যা আমাদের একটাই, সেটা হলো···

এবার একটা আধলা ইঁট এসে তাঁর মাথায় পড়লো। পড়তেই ভৈরববাবু টলে পড়ে গেলেন সিমেন্টের বাঁধানো পৈঠের ওপর। আর তাঁর মাথা দিয়ে দর-দর করে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো।

তখন আর তাঁর জ্ঞান নেই।

নস্কর-বাগান থানার ও-সি'র ওপর সেদিন লালবাজার হেড-কোয়ার্টার্স থেকে নতুন অর্ডার এল। হুকুম হলো কনফেশন আদায় করতেই হবে। দিন-ত্নপুরে কলকাতা সহরের রাস্তার ওপর পুলিশ অফিসার মার্ডার হয়ে গেল আর আশেপাশের বাড়ি থেকে কেউ দেখতে পেলে না, তা কখনও হয় না। নিশ্চয় কেউ কনফেশন করছে না। কনফেশন আদায় করো।

অধীর ব্যানার্জি টেলিফোনে বললে—আমি স্যার নিজে তদারক করতে গিয়েছিলুম, সবাই বলছে কেউ দেখেনি।

—একজন-না-একজন এমন কেউ নিশ্চয় আছে যে দেখেছে। তাকে খুঁজে বার করুন।

অধীর ব্যানার্জি বললে—খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছি স্যার, কিন্তু পেলুম না—

ওপাশ থেকে হুকুম এল—আর একবার চেষ্টা করুন। এবার আরো কড়া ইন্‌ভেষ্টিগেশন চালান। আর এক কাজ করুন, মৃত ও-সি'র বিধবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যান। তাকে দেখেও কারো-না-কারো দয়া হতে পারে। আপনি মিসেস সরকারকে নিয়েই যান এবার, দেখুন না কী হয়!

অধীর ব্যানার্জি তাই-ই করলে। মৃত ও-সি পশুপতি সরকারের বিধবা স্ত্রীর তখন শোচনীয় অবস্থা। চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি তখন বিপর্যস্ত। মহিলা অনেক কষ্ট করেছেন সংসারটাকে দাঁড় করাবার জন্যে। শেষকালে এই পরিণতিতে এসে ঠেকেছে। অনেক বলা-কওয়ার পর লাটসাহেব নিজের ফাণ্ড থেকে পাঁচ হাজার টাকা তাঁকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়েছেন।

সব শুনে মিসেস সরকার বললে—যখন বলছেন—তখন যাবো, আর তাছাড়া আমার উপায়ই বা কী ?

শেষ পর্যন্ত অধীর ব্যানার্জি একদিন ছুটির দিনে মিসেস সরকারকে নিয়ে নস্কর-বাগান লেনে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে পুলিশ কনেস্টবলের দল। পাড়ার সবাইকে জড়ো করলে ভ্যানটার সামনে। মিসেস সরকার গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো।

—আপনারা সবাই দেখুন, যিনি এখানে ক'দিন আগে খুন হয়েছিলেন তাঁরই বিধবা স্ত্রী আপনাদের সামনে! তিনি আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছেন। বলতে এসেছেন যদি আপনারা কেউ তাঁর স্বামীকে কে বা কারা খুন করেছে দেখে থাকেন তো তাদের নাম বলে দিন। যারা এঁর চরম সর্বনাশ করেছে তাদের শাস্তি হোক, এটা যদি আপনারা চান তো আশা করি, নাম বলতে আপনাদের বাধা হবে না—

বারো নম্বর নস্কর-বাগান লেনের ভাড়াটে বাড়ির ভেতরের উঠোনের কোণে তখন প্রভা রান্না করছিল। ভৈরববাবু ডাকলেন —ও মা, প্রভা—

প্রভা রান্না করতে করতেই উত্তর দিলে—কী বলছো ?

—বলি হ্যাঁ রে, বাইরে কিসের গোলমাল হচ্ছে রে? কী হয়েছে বাইরে ?

প্রভা বললে—ও কিছু না, তুমি শুয়ে থাকো—

ভৈরববাবু বিরক্ত হলেন। বললেন—আর কত শুয়ে থাকবো বল্ দিকিনি ?

প্রভা বললে—ডাক্তার তোমাকে বেরোতে বারণ করেছে যে, আর শোওয়া ছাড়া তোমার কাজই বা কী ?

ভৈরববাবু বললেন—কিন্তু মনটা যে বাইরে যাবার জন্যে ছটফট করছে রে। রোজ একটু পার্কে যেতুম, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল—

প্রভা বললে—ওই পার্কে গিয়েই তোমার এই হাল হলো!

পার্কে কেন গেলে? আর পার্কেই যদি যেতে তো লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কেন?

—তা এও তো বড় আবদার! আমার মুখ রয়েছে, কথা বলবো না? কথা বললেও দোষ হয়ে গেল? আমার চোখের সামনে দারোগা খুন হয়ে যাবে, আমার চোখের সামনে বাস-ট্রাম পুড়ে ছাই হবে আর আমি চুপ করে থাকবো? এ-পাড়ার দেবসুন্দরবাবু, হেরম্ববাবু, করুণাকান্তবাবু, সবাই আমাকে চুপ করে থাকতে বলেন, তুইও আমাকে চুপ করতে বলিস? তাহলে বলতে চাস্ এ পোড়া দেশ গোল্লায় যাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবো? তাহলে কলকাতায় এলুম কেন? সেই রায়পুরেই তো থাকতে পারতাম। সেখানে তো আমার কোনও কষ্টই ছিল না। সেখানকার লোকও তো আমায় থাকতে বলেছিল—

হঠাৎ বাইবে আবার একটা সোরগোল উঠলো।

—ও কীসের গোলমাল রে? ওখানে বাইরে কী হচ্ছে মা?

বাইরে তখন সত্যিই রীতিমত সভা জমে উঠেছে। করুণাবাবুকে বাইরে ডেকে নিয়ে এসেছে কনেস্টবলরা। দেবসুন্দরবাবুও এসেছেন। হেরম্ববাবুকেও ডেকে আনা হয়েছে। তাঁর ছেলে ভবেশ, নরেশ তারাও আছে। আবো আছে পাশাপাশি বাড়ির লোকজন।

—বলুন, বলুন আপনারা! একজন অনাথা বিধবার মুখের দিকে চেয়েও আপনাদের মনে দয়া হবে না? আপনাদেরই মা-বোন কিংবা মেয়ের যদি এই অবস্থা হতো? এঁর এই অবস্থায় আপনাদের নিজেদের বসিয়ে ভাবুন, তাহলেই অবস্থার গুরুত্বটা বুঝতে পারবেন। আজ এর স্বামীকে একজন খুন করেছে, এর পর একদিন আপনাদের পরমাত্মীয় কাউকেও হয়ত আবার কেউ খুন করে যাবে। সেদিনও এমনি করে আমাকেই ইন্‌ভেস্টিগেশনে আসতে হবে। তখন? তখনও আমি এমনি কবেই আপনাদের দ্বারস্থ হবো। আমার ইন্‌-ভেস্টিগেশনে সহযোগিতা করতে বলবো, সাহায্য করতে বলবো। আজকে পুলিশ অফিসার মারা গেছে বলে যেমন করে আপনাদের

সাহায্য চাইছি, সেদিনও তেমনি করে আপনাদের কাছেই সাহায্য চাইবো। আমার ডিউটিই এই। কিন্তু ডিউটিই তো সব নয়। ডিউটির ওপরেও আর একটা জিনিস আছে তার নাম মানবতাবোধ, তার নাম মনুষ্যত্ব। আপনাদের সেই মানবতাবোধ, সেই মনুষ্যত্বের কাছে আমি আবেদন করছি, এই অনাথা বিধবার মুখ চেয়ে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। আমি তার প্রতিবিধান করবো। আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে আপনাদের পাড়াতে শান্তি বিরাজ করে, আপনারা নির্বিঘ্নে নিজেদের কাজকর্ম জীবন-যাত্রা চালিয়ে যেতে পারেন······

অধীর ব্যানার্জি যখন স্কুলে পড়তো তখন বিদ্যাসাগরের ওপর প্রবন্ধ রচনা করে বাংলায় ফার্ষ্ট হয়েছিল।

বাংলার মাস্টার কাশীশ্বর বোস স্যার বলেছিলেন—তুমি একদিন ভালো সাহিত্যিক হবে অধীর—

মাস্টার মশাই-এর সেদিনকার সেই আশা পূরণ হয়নি। ভাল-ভাল কথা গুছিয়ে বলতে পারলেই যদি সাহিত্যিক হওয়া যেত তো অধীর ব্যানার্জি আজ নস্কর-বাগান থানার ও-সি না হয়ে অন্য কিছু হতো।

কাশীশ্বর বোস মারা গিয়ে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁকে আজকের এই অশান্তির জ্বালা সইতে হয়নি। কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিলেন অসংখ্য ছাত্রের আশীর্বাদ তিনি পেয়ে গেছেন। ছাত্রদের তিনি নিজের বাড়িতে পড়াতেন। তাদের মুড়ি খেতে দিতেন। তার জন্যে একটা পয়সা কখনও চাননি। বিশেষ করে অধীর নিজে ছিল গরীবের ছেলে। বিধবার একমাত্র সন্তান।

মনে আছে অধীর ব্যানার্জির বাবা যেদিন মারা গেলেন কাশীশ্বর স্যার খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছিলেন।

অধীর কাঁদছে দেখে বলেছিলেন—কান্দিস নি রে, কান্দিস নি। তোর বাবা মারা গেছে তাতে কী হয়েছে। বাবা তো সকলেরই একদিন-না-একদিন মারা যায়। আর আমি তো আছি। তোর মত

আমারও বাবা একদিন মারা গিয়েছিলেন, আমিও তোর মত কেঁদেছিলুম রে। চুপ কর—চুপ কর তুই—

তারপর কোথায় গেলেন সেই কাশীশ্বর বোস স্যার। আর কোথায় গেল সেই স্কুল। একদিন কাশীশ্বর বোস স্যার হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাঁর বিধবা স্ত্রী শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে প্রায় বলতে গেলে ভিক্ষে করে কাটিয়েছিলেন।

কিন্তু অধীর ব্যানার্জির তখন এমনই অবস্থা যে নিজেরই খাওয়া জুটতো না। সেই মৃত শিক্ষকের বিধবা স্ত্রীকে কী করে ভরণ-পোষণ করবে!

জীবন বোধহয় কোনও ম্যাজিক জানে। অফুরন্ত শক্তি বোধ হয় মানুষের জীবনের। নইলে এত দুর্যোগ, এত বিপর্যয়, এত ভাগ্যহীনতার মধ্যে অধীর ব্যানার্জি এখনও বেঁচে আছে কেমন করে! পাকিস্তান থেকে বিধবা মাকে নিয়ে যখন এখানে এই কলকাতায় এসে উঠেছিল তখন তো কল্পনাও করেনি যে, এই চাকরি সে পাবে। দুটো খেতে পাবার মত চাকরি পেলেই সে তার ভাগ্য-দেবতাকে ধন্যবাদ দিত। বলতে গেলে এ চাকরি তো তার কাছে স্বর্গ। অর্থাৎ স্বর্গ পাওয়া।

কিন্তু সেই চাকরিই যে শেষকালে এমন অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত!

যারা দু'পয়সা হাতাতে পারে তাদের কাছে এ-চাকবি সত্যিই স্বর্গের চাবি-কাঠি পাওয়া। এই চাকরিতে ঢুকে কয়েক বছরেব মধ্যেই দশ লাখ টাকার মালিক হয়ে গেছে, এমন খবরও অধীর ব্যানার্জি জানে। কিন্তু অধীর ব্যানার্জির টাকা নিতে কী-রকম যেন বাধে। অথচ কত লোক টাকা দিতে আসে। ঠিক ঘুঁষ নয়। উপকারের প্রতিদান। লাখ-লাখ টাকার উপকারের বদলে কয়েক হাজার টাকার কৃতজ্ঞতা। তা নিতেও অধীর ব্যানার্জির আপত্তি।

বলে—টাকা আমাকে দিতে হবে না। এ তো আমার ডিউটি।

আমি আপনার উপকার করিনি, আমি শুধু আমার ডিউটিই করেছি—

কিন্তু বাড়িতে মাধবী বড় কষ্ট করে সাংসার চালায়। অধীর ব্যানার্জি তো ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ডিউটি করতেই ব্যস্ত। এক-একদিন সারা রাতই বাড়ি ফিরতে পারে না। পার্টিতে-পার্টিতে ঝগড়া। দু'-পার্টিই মিনিস্ট্রি পেতে চায়। ভোটে জিতে পার্টির লীডাররা মন্ত্রীর গদিতে বসতে চায়। পাড়ায়-পাড়ায় পার্টির ক্যাডারদের মধ্যে তাই নিয়ে ঝগড়া! মাঝখান থেকে যত কিছু চাপ এসে পড়ে পুলিশের ওপর। কত কনেস্টবল কত এস-আই অধীর ব্যানার্জির চোখের সামনে বোমার ঘায়ে মারা গেছে! এই থানারই ও-সি তো হঠাৎ খুন হয়ে গেল। একদিন অধীর ব্যানার্জিও হয়ত খুন হয়ে যাবে। কে বলতে পারে!

মাধবী দরকার পড়লেই টাকা চায়। মাসের শেষের দিকে অধীর ব্যানার্জির হাতে আর কোনও টাকা থাকে না।

বলে—এই ক'টা দিন কোনও রকম করে চালিয়ে নাও, তার পরেই তো মাইনে পাচ্ছি—

অথচ আশেপাশের থানার ও-সিদের বাড়িতে ফ্রিজ, ট্রানজিসটার, টেপ-রেকর্ডার, রেকর্ড-চেঞ্জার, কোনও কিছুরই অভাব নেই। ব্যাঙ্কে নানা নামে কালো টাকা রেখে দিয়েছে তারা। তারা কখনও সন্তোষ সরকার, আবার কখনও পঞ্চানন ঘোষ, আবার কখনও পরেশ সান্যাল। এ-সব জানে অধীর ব্যানার্জি।

কিন্তু সেই অধীর ব্যানার্জিকেই আজ এতগুলো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে সৎ হতে উপদেশ দিতে হচ্ছে।

আশ্চর্য! যে যুগে সততা সত্যবাদিতা শব্দগুলো মানুষের জীবন থেকে উহ্য হয়ে গেছে, সেই যুগে মধ্যবিত্ত মানুষের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাকে সেই সততা আর সত্যবাদিতা পালন করতে পরামর্শ দিতে হচ্ছে। ভাগ্যের এ-ও তো এক নিষ্ঠুর পরিহাস।

—বলুন, আপনারা চুপ করে রয়েছেন কেন? আপনাদের

বাড়ির সামনে দিনের আলোয় এত বড় একটা খুন হয়ে গেল আর আপনারা কেউ-ই দেখতে পেলেন না, এটাও কি গভর্ণমেণ্টকে বিশ্বাস করতে বলেন? গভর্ণমেণ্ট তো আপনাদের ভালোর জন্যে আমাদের মাইনে দিয়ে রেখেছে। সেই আপনাদের ভালো কে করবে? বলুন, কে ভালো করবে আপনাদের?

মৃত ও-সি'র বিধবা স্ত্রী লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে তখনও আঁচলে চোখ মুছছে।

বাইরের রাস্তায় যখন মানুষের ভিড় জমেছে, করুণাকান্তবাবুর গৃহিণী তখন জানালার ফাঁক দিয়ে সব দেখছেন। বার বার করে তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন যেন কর্তা কিছুতেই না বলেন যে, তিনি সমস্ত ঘটনা দেখেছেন।

করুণাকান্তবাবু বলেছিলেন—কেন, বলে দিই না সব ঘটনাটা। আমি তো সব দেখেছি। হলদে সার্ট পরা, লম্বা জুলফিওয়ালা ছেলেটাকেও ধরবে, আমাদের বাড়ির এই ছুঁড়িটাকেও ধরবে! আপদ বিদেয় হবে!

গৃহিণী বলেছিলেন—তোমার কী যে বুদ্ধি! তুমি না হয় সব ঠিকই বললে, কিন্তু তারপর? তারপর তোমাকেই যদি কেউ খুন করে ফেলে, তখন?

এ-কথাটা ভেবে দেখেননি করুণাকান্তবাবু। বললেন—তাও তো বটে। তাহলে কি বলবো?

—বলবে আবার কি! কিছুই বলবে না। শুধু বলবে তুমি জানো না। কার স্বামী মরলো, কে বিধবা হলো, তাতে আমাদের কি?

দেবসুন্দরবাবুর বাড়িতেও ওই একই অবস্থা। পুলিশের ডাক পেয়েই দেবসুন্দরবাবু কাঁপতে আরম্ভ করেছিলেন। সোজা ভেতরে চলে গেলেন।

ডাকলেন—ওগো, কোথায় গেলে তুমি?

গৃহিণী সেই দোতলায় তখন পানদোক্তা মুখে পুরে দিয়েছিলেন। সুতরাং সাড়া দেবার মত অবস্থা নেই তখন তাঁর।

দেবসুন্দরবাবু কাছে গিবে বললেন—ওগো, শুনছো, আব এক বিপদ হয়েছে, পুলিশ এসে রাস্তায় ডাকছে—

গৃহিণী পানের পিক্ ফেলে এলেন বাথরুমে গিয়ে। বললেন—সারাদিন খেটে-খুটে একটু যে পান খাবো, তাবও উপায় নেই তোমার জন্যে। পিক্‌টা ফেলালে তবে ছাড়লে। তা কেন? পুলিশ তোমাকে ডাকছে কেন?

—কী জানি কেন! শুনলুম তো সেই পুলিশেব দাবোগাব বিধবা বউটাকে নাকি রাস্তায় ধরে নিয়ে এসেছে। বলছে, তাব স্বামীকে কে খুন করেছে তার নাম বলতে হবে—

—তা বলো গিয়ে।

—পাগল হয়েছো। আমি নাম-ধাম বলি আব আমাকে খুন করে ফেলুক ওরা। আমি বলবো আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই দেখিনি—

তারপর ডাকলেন—বঘুবীব! রঘুবীব কোথায় বে?

বলতে বলতে নিচের দিকে আসছিলেন। সিঁড়িব মাঝপথেই রঘুবীবের সঙ্গে দেখা।

—কী রে? কী করছিলি? শোন ইদিকে। পাড়ায় পুলিশ এসেছে। বুঝলি? সেবাবে যেমন এসেছিল, এবাবেও তেমনি এসেছে। এসে যদি তোদের ডাকে, ডেকে জিজ্ঞেস করে—কে দাবোগাবাবুকে খুন করেছিল তোবা জানিস কিনা, তুই বলবি জানি না। বুঝলি? বুঝলি তো? তুই বলবি তুই জানিস না, বুঝলি তো?

রঘুবীর বললে—হ্যাঁ বাবু—

—হ্যাঁ, ঠিক যেন মনে থাকে তখন!

—হ্যাঁ, মনে থাকবে।

দেবসুন্দরবাবু বললেন—কমলা কোথায়? কমলাকে ডেকে আন আমার সামনে—

কমলাকে ডেকে আনলে রঘুবীব। দেবসুন্দরবাবু কমলাকেও সেই একই কথাগুলো বললেন। শেষকালে বললেন—বুঝলে তো?

পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা, বুঝলে? আমি যা বলছি তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছি—

বলে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু অবস্থা বেশি শোচনীয় হলো হেরম্ববাবুর। তিনি বললেন—তোমরা বলে দাও না যে, আমি ব্লাড-প্রেসারের রুগী, আমার মাথা ঘুরছে, আমি যেতে পারবো না।

ভবেশ বললে—না বাবা, আপনার গিয়ে দাঁড়ানো দরকার, নইলে পুলিশ আপনাকেই সন্দেহ করবে—

—তা আমি গিয়ে কী বলবো?

—বলবেন আপনি ব্লাড-প্রেসারের রুগী, আপনি কিছুই দেখেননি। মিথ্যে কথা বলবেন!

—মিথ্যে কথা বললে যদি আবার উল্টো উৎপত্তি হয়?

—কেন উল্টো উৎপত্তি হবে? কেউ তো জোর করে আপনার কাছে কথা আদায় করতে পারবে না।

হেরম্ববাবু বললেন—কিন্তু আমি যে দেখেছি সব। যদি সত্যি কথা আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়?

গৃহিণী পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন এতক্ষণ। তিনি বললেন—ওই দ্যাখ, তোর বাবার কাণ্ড দ্যাখ, কোন্ মানুষকে নিয়ে এ্যাদ্দিন ঘর করেছি তোরা দ্যাখ্। সত্যি কথা ওমনি মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলেই হলো? আমাদের গেরস্থর ভালো-মন্দ বড় হলো না, তোমার কাছে সত্যি কথাটাই সবচেয়ে বড় হলো? তোমার ছেলে-মেয়ে-বউ-এর মুখ চেয়েও মিথ্যে কথা বলতে পারবে না? তাহলে বিয়েই বা করেছিলে কেন, আর সংসারই বা করতে তোমাকে কে বলেছিল?

হেরম্ববাবুর ব্লাড-প্রেসার তখন এমনিতেই বেড়ে গিয়েছিল, এসব কথায় তা আরো বেড়ে গেল। তিনি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তার দিকে চলতে লাগলেন।

কিন্তু একদিকে নস্কর-বাগান লেনের ওপরে দাঁড়িয়ে ও-সি অধীর ব্যানার্জি যখন সততার নামে, সত্যবাদিতার নামে পাড়ার সমস্ত লোকের সামনে আবেদন জানাচ্ছে, তখন উত্তর কলকাতার একটা স্কুলের ভেতরে ঢুকে একদল ছেলে চেয়ার-টেবিল ভাঙছে, টেলিফোনের তার কাটছে, বোমা ফাটাচ্ছে আর বিল্ডিঙের মাথায় লাল ফ্ল্যাগ টাঙিয়ে দিচ্ছে। হেডমাস্টার ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপছে। স্কুলের সমস্ত ছাত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে হাঁ করে ছেলেদের কাণ্ডকারখানা দেখছে আর স্কুল থেকে মুক্তি পাবার আশায় প্রহর গুণছে।

হঠাৎ চিৎকার উঠলো—লাল সেলাম জিন্দাবাদ—

অধীর ব্যানার্জির বাড়িতে তখন আর এক কাণ্ড। অধীর ব্যানার্জির ছোট মেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি আসছিল। সে ভোরবেলা স্কুলে যায় আর বারোটার সময় রোজ বাড়ি ফেরে। কিন্তু দুপুর হয়ে গেল তখনও মেয়ে ফিরছে না দেখে মাধবী থানার অফিসে খবর দিলে।

কিন্তু মেয়ে যখন ফিরলো, তখন সে হাই-হাউ করে কাঁদছে।

—কী হলো রে? কী হলো? কাঁদছিস কেন?

কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে যা বললে, তা শুনে মাধবী অবাক। দু'হাতে সরু দু'গাছা সোনার রুলি গড়িয়ে দিয়েছিল মেয়েকে। এমনিতে কখনও তা পরে না স্নুনু। কিন্তু সেদিন ছিল তার জন্মদিন। ভেবেছিল জন্মদিনে একটু পরুক। তা সেইটেই কে ছিনতাই করে নিয়েছে!

—কে নিলে তোর সোনার রুলি?

—একটা লোক।

—তা তোর সোনার রুলি হাত থেকে কেড়ে নিলে আর তুই কিছু বললি নে ? কী-রকম চেহারা লোকটার ?

সুনু কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলে—কালো মতন—

—তুই দৌড়ে পালিয়ে এলি নে কেন ?

—সে আমাকে ল্যাবেঞ্জুস খেতে দিলে।

সর্বনাশ। লজেন্স খেতে দিয়েছে তাই রক্ষে, তার বদলে বিষ খেতে দিলে কী-ই বা করবার ছিল মাধবীর। যে-কনেস্টবলটা থানায় খবর দিতে গিয়েছিল তাকে মাধবী জিজ্ঞেস করলে—বড়বাবু কোথায় রে ?

—তিনি তো নস্কর-বাগান লেনে ডিউটিতেই গেছেন।

নস্কর-বাগান লেনের ওপর তখন আরো ভিড় জমে গেছে। অধীর ব্যানার্জির গলা তখন লেকচার দিতে দিতে আবেগে বন্ধ হয়ে এসেছে। সে বলে চলেছে—আমি পুলিশ বটে, কিন্তু আমিও তো মানুষ, আমারও তো আপনাদের মত ছেলেমেয়ে-পরিবার আছে। আমাকেও তো আপনাদের মত সংসার করতে হয়। আমাকেও রাস্তায় বাসে-ট্রামে চড়তে হয়। আমার সমস্ত কিছুই আপনাদের মত। আপনাদের যা সমস্যা, আমারও তাই-ই। আপনাদের যেমন জিনিসপত্রের দাম বাড়লে দেনা করতে হয়, আমারও তেমনি। তাই আজ আপনাদের একজন হয়েই আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, আপনারা আমায় সাহায্য করুন, শান্তি ফিরিয়ে আনতে দিন। সারা পৃথিবীই আজ শান্তির জন্যে আবেদন করছে, আমাদের সরকারও কলকাতায় শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে···আপনারা যাতে সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারেন সেইজন্যেই আমি আজ এখানে এসেছি।
—আপনি কিছু জানেন ? আপনি ?

ভবেশের দিকে চেয়ে আঙুল দিয়ে দেখালে অধীর ব্যানার্জি।

—আপনি ? আপনি কিছু জানেন ?

ভবেশ বললে—আমি তখন অফিসে গিয়েছিলুম, আমি কিছু

দেখতে পাইনি—

—আপনি ?

এবার নরেশের দিকে আঙুল দেখালে অধীর ব্যানার্জি।

নরেশ বললে—আমি তো তখন কলেজে—

—আপনি ?

এবার দেবসুন্দরবাবুব দিকে আঙুল দেখালে অধীর ব্যানার্জি।

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আমি বিটায়ার্ড লোক, রিটায়ার্ড গভর্মেণ্ট অফিসার, আমার সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া অভ্যেস। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে তেতলায় আমার শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছি।

—আপনার ছেলে-টেলে কেউ নেই ? তারা দেখেনি ?

—তাবা সব বাইরে চাকরি করে, একজন বোম্বেতে, আর একজন দিল্লীতে—

অধীর ব্যানার্জি অবাক হয়ে গেল। বললে—ভারি আশ্চর্য তো, আপনারা এতগুলো ভদ্রলোক পাড়ায় বাস করেন, আপনাদেব বাড়ির সামনে স্পষ্ট দিনের আলোয় এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল, আর আপনারা কেউ-ই দেখতে পেলেন না ? এও কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন ?

—তা আপনি ?

এবার হেরম্ববাবুর পালা।

হেরম্ববাবু বললেন—না, আমি দেখিনি—

—কেন—দেখেননি কেন ? আপনি তখন কী করছিলেন ?

—আমি ব্লাড-প্রেসারের রুগী, সব সময় আমার মাথা ঘোরে। ডাক্তার আমাকে হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে বারণ করেছে। আমি তাই কোনও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পারতপক্ষে থাকি না।

—আপনার ছেলে ?

—ওই তো দুই ছেলে। তারা তো আগেই বলেছে যা বলবার—

—আপনার স্ত্রী কিছু দেখেছেন ? এমনও তো হতে পারে যে

ঠিক সেই সময়ে গোলমাল শুনে তিনি জানালার ধারে এসে অপরাধীকে দেখতে পেলেন—

হেরম্ববাবুর হয়ে ভবেশই উত্তর দিলে। বললে—না, সংসারের সমস্ত কাজ মাকে একলাই করতে হয়, তাই কোনও দিকে দেখবার সময় হয় না মা-র। আমাদের বাড়িতে রাঁধবার লোকও নেই—

অধীর ব্যানার্জি বললে—তাহলে দেখছি আপনারা কেউ-ই দেখেননি।

তারপরে হঠাৎ তার অন্য একজনের মুখের দিকে নজর পড়লো। জিজ্ঞেস করলে—কই, আপনি তো কিছু বলছেন না—

করুণাকান্তবাবু এতক্ষণ এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জন্যে নিজেকে আড়ালে রেখেছিলেন। বললেন—আমি? আমিও কিছুই দেখিনি স্যার—

—আপনি কী করেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—আমি? আমার বড়বাজারে স্টেশনারি দোকান আছে। আমার ছেলেরা এখন দোকান দেখাশোনা করে, আমি দোকানে শুধু মাঝে মাঝে যাই—

—ছেলেরা কোথায়? তাদের একবার ডাকুন না।

করুণাকান্তবাবু বললেন—তারা সব স্যার আলাদা-আলাদা জায়গায় বাড়ি করে আলাদা হয়ে আছে। কিন্তু শান্তি স্যার কোথাও নেই। তাদের পাড়াতেও গোলমাল সুরু হয়েছে। কলকাতায় কোন পাড়াতেই বা শান্তি আছে বলুন? কেন মরতে যে বাঙলাদেশে জন্মেছিলুম তাই ভাবি—

—আপনি না দেখতে পারেন, কিন্তু আপনার বাড়ির কেউ ঘটনাটা চোখে দেখেছেন হয়ত?

করুণাকান্তবাবু বললেন—বাড়িতে বলতে আমার গৃহিণী ছাড়া আর তো কেউ নেই। তা তিনি তো পুজো-আহ্নিক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। দিনরাত ঠাকুর আর ঠাকুর! তবে আমার বাড়িতে একজন ভাড়াটে থাকে—নিচের তলায়—

—কে? ভাড়াটে কে?

—সে একজন মেয়েমানুষ। তীর্থময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের মাস্টারনী!

অধীর ব্যানার্জি বললে—কই, তাঁকে তো দেখছি না। তাঁকে একটা খবর পাঠালে হয়।

—তার বুড়ো বাবাও ও-বাড়িতে আছেন স্যার। তাকে ডাকলেও হয়। তিনি হয়ত ঘটনাটা দেখে থাকতে পারেন, হয়ত বলতে পারেন কে আসলে খুন করেছে, কী-রকম চেহারা তার।

হরস্বরবাবু বললেন—তিনি আসতে পারবেন না স্যার। তিনি অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তিনি পার্কে বেড়াচ্ছিলেন, কে যেন তার মাথায় ইট ছুঁড়ে মেরেছে—সারা মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন।

অধীর ব্যানার্জি বললেন—তাহলে তাঁর মেয়ের সঙ্গেই আগে কথা বলি? তিনি এখন বাড়িতে আছেন তো?

সবাই বললে—হ্যাঁ স্যার, বাড়িতে আছেন—

—তাহলে আমি সেখানেই যাচ্ছি—

বলে অধীর ব্যানার্জি এগোল বাড়িটার দিকে।

চলতে গিয়ে একবার পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলে—কী নাম বললেন মহিলার?

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—প্রভা চক্রবর্তী—

একলা-একলা অন্ধকার তক্তপোষটার ওপর শুয়ে শুয়ে ভৈরববাবু তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। আর কতদিন শুয়ে থাকা যায়। অথচ যখন রায়পুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন তখন কত আশা ছিল তাঁর। নিজের দেশে আসছেন। সেই পিতৃ-পুরুষের জন্মস্থান! নিজের মেয়ে যখন কলেজ থেকে পাশ করে বেরোল, তখন হয়ত মধ্যপ্রদেশেই একটা চাকরি পেত সে। কিন্তু কেন যে কলকাতায় চাকরি নিলে প্রভা! আর কলকাতার নাম শুনে তিনিও আপত্তি করলেন না। কলকাতা! কলকাতার কথা ভাবলেই তাঁর মনে পড়তো রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, সুভাষ বোসের কলকাতা। সেই কলকাতার জল-হাওয়া মাটিও যেন পবিত্র। যাক, প্রভা কলকাতাতেই যাক। তারপর চাকরি থেকে রিটায়ার করে তিনিও কলকাতায় গিয়ে শান্তিতে বাস করবেন।

মিস্টার মহাজন বলেছিলেন—কেন মিছিমিছি যাচ্ছেন সেখানে ভৈরববাবু, সে-কলকাতা কি আর এখন তেমন আছে! বরং আপনার মেয়েকে এখানে আসতে বলুন, আমি এখানে প্রভার একটা চাকরি করে দেব—

ভৈরববাবু সে-কথা শুনে হেসেছিলেন। বলেছিলেন—না মিস্টার মহাজন, যে-ক'টা দিন বাঁচি বাঙলাদেশেই কাটাবো! বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, নেতাজীর দেশ আমার দেশ। মরলে বাঙলাদেশের মাটিতেই মরব—এতে আপনি বাধা দেবেন না—

তা শেষ পর্যন্ত মিস্টার মহাজন বাধা দেননি। রায়পুরের কেউই বাধা দেয়নি। বরং আসবার সময় খুব ঘটা করে ফেয়ারওয়েল দিয়েছিল তারা তাদের অফিসের সুপারিনটেনডেন্টকে—

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কেন এলেন তিনি! প্রভাই বা কেন এল!

এক-একদিন প্রভাকে তিনি বলতেন—হ্যাঁ রে, কলকাতায় তোর ভাল লাগছে?

প্রভা বলতো—কেন, তোমার ভালো লাগছে না বুঝি?

ভৈরববাবু বলতেন—না রে, তা নয়, আমি বড় আশা করে এসেছিলুম রে। ভেবেছিলুম এ সেই বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, সুভাষ বোসের দেশ, এখানেই শেষ জীবনটা কাটাবো। কিন্তু এ দেশ যে এমন হয়ে গেছে তা ভাবতে পারিনি—

প্রভা জিজ্ঞেস করতো—কেন, কী রকম হয়ে গেছে?

ভৈরববাবু বলতেন—সবাই যেন কেমন হয়ে গেছে মা। সব রোগা-রোগা চেহারা, দেখে মনে হয় যেন খেতে পায় না, কিন্তু বাইরে পোষাক-পরিচ্ছদের চাকচিক্য আছে সকলের। ট্রামে-বাসে উঠে ভাড়া না-দেবার মতলব, বোমা নিয়ে মারামারি, পরীক্ষার হলে শুনেছি নাকি নকল করবার চেষ্টা, গার্ডদের খুন করে পালায়। এরা কি মানুষ? সব যে জানোয়ার হয়ে গেছে রে। এখানে থাকলে আমিও মারা যাবো, তুইও মারা যাবি, দেখে নিস্—এ কী রাজ্যে বাস করছি আমরা! দুধ পাব না, জল পাব না, ইলেকট্রিক লাইট পাবে না মানুষ—রোজই হরতাল—

প্রভার ভালো লাগতো না এ-সব কথা। বলতো—তা এর জন্যে কে দায়ী?

ভৈরববাবু অবাক হয়ে যেতেন প্রভার কথা শুনে। বলতেন—কে আবার দায়ী, বাঙালীরাই দায়ী—

—না, বাঙালীরা দায়ী নয়।

—তাহলে কে দায়ী?

প্রভা বলতো—তোমার এখানে থাকতে ভালো না লাগে তুমি রায়পুরে চলে যাও। আমি এখানেই থাকবো!

ভৈরববাবু বলতেন—তা এর জন্যে কে দায়ী তা বলবি তো?

অন্য লোকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ভাবছিস তুই বেঁচে যাবি? আমাদের ঘর, আমাদের বাড়ি, আমাদের পুলিশ, আমাদের সরকার, আমাদের সব কিছু। এখন তো আর ইংরেজরা নেই যে ইংরেজদের ঘাড়ে দোষ চাপাবি? সেদিন পার্কে কোনও কিছু নেই—এই সব কথাই বলছিলুম এক ভদ্রলোককে, দেখতে দেখতে অনেক লোক জমে গেল, হঠাৎ আমার মাথায় এসে একটা ইট পড়লো? তা আমি কী দোষ করলুম বল্ তো? আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি—

প্রভা বলতো—হ্যাঁ, তুমি অন্যায়ই বলেছ। সেই জন্যেই তো তোমায় বলি তুমি বাইরে যেও না—বাইরে কারোর সঙ্গে মিশো না, কারোর সঙ্গে কথা বোল না।

—তা ন্যায্য কথা বলবো না?

—কোন্‌টা ন্যায্য আর কোনটা অন্যায্য তা তুমি বুঝবে না।

—বাসে-ট্রামে উঠে ভাড়া না-দেওয়াটা অন্যায্য নয়?

প্রভা রেগে উঠে গলা চড়াতো। বলতো—না, অন্যায্য নয়। ভাড়া দেয় না বেশ করে! বাস-কোম্পানীর কর্তারা যখন লাখ-লাখ টাকা চুরি করে নিজেদের পকেট ভরায় তখন তো কেউ তাদের ধরে না, কেউ তাদের জেলে পোরে না! আর আট-দশ পয়সার টিকিট না কিনলেই বুঝি মহা-অপরাধ হয়ে গেল? তাই তো তারা আজ পয়সা ফাঁকি দিয়ে বাসে উঠছে। বাস-ট্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে—

ভৈরববাবু হেরে যেতেন তর্কে। বলতেন—তোর সঙ্গে দেখছি কথা বলাই দায়! অন্য লোকে চুরি করছে বলে আমিও চুরি করবো? এই হলো তোর যুক্তি?

এক-একদিন চুপি চুপি উঠে বাইরে যেতে ইচ্ছে করে ভৈরববাবুর। কিন্তু উঠতে গেলেই মাথাটা কেমন ঘুরে যায়। আবার চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েন। সকালবেলা ইস্কুলে যাবার সময় প্রভা সদর দরজায় তালা লাগিয়ে চলে যায়, যাতে বাবা বাড়ীর বাইরে যেতে না পারে। তারপর বেলা হলে যখন ইস্কুল থেকে ফেরে তখন তালা খুলে আবার বাড়ি ঢোকে।

ভৈরববাবু জানালার ধারে এসে বাইরের একফালি আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। রায়পুরে ওই আকাশটা কত বড় ছিল, কত তার বিস্তার ছিল। এখানে এসে একফালি আকাশের মত সকলের মন বুদ্ধি ভাবনা আশা কামনা-বাসনাও যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। বাঙলাদেশের মানুষের পরমায়ুও যেন কমে গেছে ওই একফালি আকাশের মত।

—ওরে ও প্রভা. কী করছিস মা তুই?

প্রভা রান্নাঘরে বসেই বললে—কেন?

—আমি একটু বাইরে যাবো মা? আর যে চুপ করে শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না রে!

—কিন্তু বাইরে গিয়ে যদি তুমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাও?

ভৈরববাবু বললেন—তা গায়ে বলই বা পাচ্ছিনে কেন বল তো মা? আগেকার মত শরীরে জোর হচ্ছে না কেন আমার?

প্রভা উঠে এসে ভৈরববাবুর সামনে দাড়ালো।

বললে—কেন বল পাবে শুনি? তোমাকে কি আমি খাঁটি দুধ খাওয়াতে পারি? ফল খাওয়াতে পারি? দামী ওষুধ ভিটামিন খাওয়াতে পারি যে তুমি শরীরে বল পাবে? ও-সব মিনিস্টার আর গেজেটেড অফিসারদের জন্যে ঠিকই বরাদ্দ আছে তাদের কোনও অভাব নেই, দেখে এসো তাদের বাড়িতে গিয়ে। আমরাই যত ভেজাল খাবো! কেন, আমরা খাঁটি জিনিস হজম করতে পারি না? গয়লা যখন দুধে জল মেশায় তখন তা ভেজাল দুধ হয়, আর গভর্ণমেণ্ট যখন দুধে জল মেশায় তখন তা হয় টোনড্-মিল্ক! আমরা কেবল সেই টোনড্-মিল্ক খাবো—

ভৈরববাবু বললেন—তুই অত রাগ করছিস কেন?

—রাগ করছি কি সাধে? রাগের আমার তুমি দেখেছ কী? কতটুকু রাগ দেখেছ? এই রাগের আগুনে দেখবে একদিন বাঙলাদেশ পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এখন এই ক'টা বাস পুড়তে দেখেই তুমি অবাক হচ্ছ, শেষকালে সেই আগুন সামলাতে সমস্ত

ভারতবর্ষকে আহুতি দিতে হবে তা মনে রেখো! তোমার সাধের রায়পুরও সে-আগুন থেকে রক্ষে পাবে না। এখন তো তারা হাসছে আমাদের কষ্ট দেখে, কিন্তু ঘুঁটে পুড়লে তো গোবর চিরকালই হাসে—

ভৈরববাবু বললেন—তুই কি কম্যুনিস্ট হয়ে গেলি নাকি মা?

প্রভা বললে—কম্যুনিস্ট হতে যাবো কোন্ দুঃখে? আমি মুখ ফুটে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথাও বলতে পারবো না? তা বললেও কমিউনিস্ট হয়ে যাবো? তাহলে তো সমস্ত বাঙালীই কমিউনিস্ট—আমি দুশো কুড়ি টাকা মাইনে পাই, সেই টাকায় কী করে যে সংসার চালাচ্ছি তা আমিই জানি। এর ওপর একটা অসুখ হলে আমার মুখ দিয়ে যদি কোনো শক্ত কথা বেরিয়েই যায় তো আমি সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট হয়ে গেলুম?

—কিন্তু তুই তো খবরের কাগজে পড়েছিস মা, গভর্ণমেণ্টের টাকা নেই, টাকার বড় অভাব—

প্রভা বললে—দেখ বাবা, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। টাকা নেই বলে দিল্লীতে কতগুলো মিনিস্টার পোষা হয়েছে জানো? তাদের মাইনে কত জানো? তারা এক-একজন বছরে কত আয় করে তা জানো?

ভৈরববাবু বললেন—তোর কেবল রাগ ওদের ওপর, আগে নিজেদের দোষটা ছাখ—

হঠাৎ বাইরে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

—মিস চক্রবর্তী আছেন?

প্রভা বুঝতে পারলে কারা এসেছে। বাবাকে রেখে নিজের ঘরে ঢুকলো। সেখান দিয়ে বাইরের সদরের রাস্তা।

প্রভা বললে—বাবা, আমি তোমার দিকের জানলা-দরজা সব খিল দিয়ে বন্ধ করে দিলুম—

বলে সদর দরজাটা খুলে দিলে। খুলে দিতেই দেখা গেল একদল লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে সামনের দিকে পুলিশের

ইউনিফর্ম-পরা নস্কর-বাগান থানার ও-সি। আর তার পাশে সামান্য ঘোমটা-টানা একজন বিধবা মহিলা।

—আপনার নামই কি মিস্ প্রভা চক্রবর্তী?

প্রভা বললে—হ্যাঁ। কিন্তু আপনাদের সকলকে বসতে দেবার মত জায়গা তো আমার ঘরে নেই, আমার এই একটাই ঘর—

অধীর ব্যানার্জি বললে—আমাদের বসতে দিতে হবে না, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গোটাকতক কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে। আপনি উত্তর দিলে খুশী হবো। আমার নাম অধীর ব্যানার্জি, আমি নস্কর-বাগান থানার ও-সি। আর ইনি হচ্ছেন আগেকার মৃত ও-সি'র স্ত্রী। আমি শুধু আপনার কাছে জানতে চাই এই মহিলার স্বামীকে যে আপনার বাড়ির সামনে খুন করা হয়েছিল, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

প্রভা বললে—হ্যাঁ জানি।

—তা আপনি কি বলতে পারেন কে বা কারা তাঁকে খুন করেছিল? তাদের নাম কী? আর তাও যদি না বলতে পারেন তো তাদের চেহারা কেমন তা বললেও আমাকে ইন্‌ভেস্টিগেশন করতে সাহায্য করা হবে—

প্রভা মহিলাটির কাঁদো-কাঁদো মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মহিলাটি তখন চোখ বুঁজে আছে, আর মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে।

বললে—এঁকে মিছিমিছি কষ্ট দিতে এনেছেন কেন?

অধীর ব্যানার্জি বললে—এঁকে দেখলে হয়ত দয়া হবে আপনাদের মনে, তাই। আমি এতক্ষণ পাড়ার সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। সবাই বললেন কেউই খুনটা স্বচক্ষে দেখেননি। আপনাকেই আমি শেষ জিজ্ঞেস করতে এসেছি—আপনি দেখছেন কী?

প্রভা বললে—হ্যাঁ—

অধীর ব্যানার্জির মুখ-চোখে বিস্ময়-আনন্দ কৌতূহল সবকিছু ফুটে বেরিয়ে এল। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি নোট-বইটা বার করে নিলে।

বললে—বলুন, কে খুন করেছে? কী তার নাম-ধাম-পরিচয়। কী-রকম চেহারা?

প্রভা বললে—আমি বলবো না।

খানিকটা থতমত খেয়ে গেল অধীর ব্যানার্জি। অবাক হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ মিস প্রভা চক্রবর্তীর মুখের দিকে।

বললে—আপনি বলবেন না?

প্রভা বললে—না।

অধীর ব্যানার্জির যেন তখনও মনে সন্দেহ হচ্ছে। ঠিক শুনেছে তো সে?

—আপনি সব জেনেশুনেও বলবেন না?

—না।

—তার মানে?

প্রভা বললে—তার মানে যা বোঝেন তাই। আপনিও বাঙালী, আমিও বাঙালী, আমি তো বেশ স্পষ্ট বাংলা ভাষাতেই কথা বলছি। আপনার তো বাঙলা না বোঝবার কথা নয়।

—কিন্তু আপনি তো জানেন আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারি এর জন্যে?

—হয়ত পারেন।

আশেপাশের সব লোক চুপ হয়ে শুনছে দু-জনের কথা-কাটাকাটি। দেবসুন্দরবাবু, হেরম্ববাবু, করুণাকান্তবাবু, ভবেশ, নরেশ যারা-যারা সেখানে ছিল, সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

অধীর ব্যানার্জি বললে—হয়ত নয়, সত্যিই আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারি।

প্রভা বললে—তা করুন-না। যদি আপনার সে-ক্ষমতা থাকে তো করুন। আমি তো আপনাকে কোন বাধা দিচ্ছি না—

অধীর ব্যানার্জি বললে—না, আপনি আমার ওপর রাগ করছেন। আমি তো আপনাকে কোনও রাগের কথা বলিনি। আমি সরকারি

ডিউটি করতে এসেছি। গভর্ণমেন্ট চায় এ-পাড়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে—

—মিথ্যে কথা। গভর্ণমেন্ট শান্তি চায় না।

অধীর ব্যানার্জি বললে—আপনি বলছেন কী? গভর্ণমেন্ট শান্তি চায় না? তাহলে আমাদের মত এত পুলিশ-মিলিটারি-সি-আর-পি রেখেছে কেন? কার জন্যে?

প্রভা বললে—রেখেছে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে।

—তার মানে?

—তার মানে, আপনাদের রেখেছে যাতে লাটসাহেব কিংবা মিনিস্টার কিংবা বড়লোকদের গায়ে কেউ হাত না দিতে পারে। যাতে তাদের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি, তাদের প্রপার্টি কেউ ছুঁতে না পারে! আর সত্যিই যদি বাঙলা দেশে শান্তি চাইতো তো গভর্ণমেন্ট কি দেশ পার্টিশান করতো? বাঙলা দেশটাকে ভেঙে দু-ভাগ করতো?

অধীর ব্যানার্জি বললে—সে-সব তো পুরনো কথা। আমি তখন বলতে গেলে জন্মাইনি। আর গভর্ণমেন্ট-স্টাফ হয়ে ও-সব আলোচনা আমার না-করাই উচিত। কিন্তু আজ বাঙলা দেশে যে-সব খুনখারাবি হচ্ছে এরও তো একটা বিহিত করতে হবে। আমার ওপরেই তো তার কিছুটা ভার পড়েছে—

প্রভা বললে—যদি পারেন তো বিহিত করুন—

অধীর ব্যানার্জি বললে—সেই বিহিত করতেই তো আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি। আর এর বিহিত হওয়াও তো দরকার। এ-সব কি আপনিই সমর্থন করেন?

—করি!

—আপনি এ-সব সমর্থন করেন? এই মারামারি, কাটাকাটি, বাস-ট্রাম পোড়ানো, এই স্কুল-কলেজে ঢুকে বোমা ছোঁড়া, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ পোড়ানো, আপনি এ-সব সমর্থন করেন?

প্রভা আবার জোর গলায় বলে উঠলো—করি—

অধীর ব্যানার্জি এবার প্রভার মুখের দিকে আরো ভালো করে চেয়ে দেখলো। সে-মুখে কোনও দ্বিধা, সঙ্কোচ, অস্পষ্টতা, কিছু নেই। গলার আওয়াজটা পর্যন্ত কাঁপছে না।

—সত্যিই আপনি সমর্থন করেন?

প্রভা বললে—হ্যাঁ, করি, করি, করি—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—কেন করবো না বলুন? গভর্ণমেণ্ট আমাদের জন্যে কী করেছে যে, সমর্থন করবো না? আপনাদের গভর্ণমেণ্ট আমাদের খেতে দিয়েছে? পরতে দিয়েছে? এই বাঙলা দেশে এত হাজার রিফিউজি এসেছে, এদের কথা ভেবেছে কখনও? পাঞ্জাব থেকে যে-সব পাঞ্জাবী রিফিউজি এসেছে, তাদের ফেলে-আসা সমস্ত সম্পত্তির হিসেব করে পরিবার পিছু জমি, বাড়ি, টাকা সবকিছুর জন্যে কোটি-কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে। আর বাঙলা দেশের রিফিউজিদের বেলায়? তাদের শুধু দিয়েছে ক্যাশ-ডোল। তাদের বেলায় শুধু ভিক্ষে! কোটি কোটি বাঙালী বাস্তুহারাকে শুধু ভিখিরির জাতে পরিণত করেছে। তবু বলছেন, কেন আমি এই গুণ্ডামি সমর্থন করছি?

অধীর ব্যানার্জি চুপ।

—কই, চুপ করে রইলেন কেন? কথা বলুন, উত্তর দিন? আরো শুনতে চান? বাঙলা দেশের কয়লার কথাই ধরুন। এই কয়লা আমরা বাংলা দেশে বসে যে-দরে কিনি, পাঞ্জাবের লোকেরাও সেই একই দরে পায়। কিন্তু চাল, গম? সে-দেশ থেকে যখন চাল-গম বাঙলা দেশে আসে, তখন বাঙালীদের বাড়তি দাম দিতে হয়। কেন? কয়লার বেলায় এক নিয়ম, আর চাল-গমের বেলায় বুঝি আলাদা নিয়ম হতে হবে? এই আপনাদের গভর্ণমেণ্টের শান্তি চাওয়ার নমুনা? এতেও বিশ্বাস করতে হবে গভর্ণমেণ্ট শান্তি চায়?

অধীর ব্যানার্জি তখনও চুপ। দেবসুন্দরবাবু, হেরম্ববাবু, করুণাকান্তবাবু সবাই যেন কেমন বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলেন।

খানিক পরে দেবসুন্দরবাবু বলতে গেলেন—কিন্তু মা, আমার বাড়ির দেয়ালে যে আলকাতরা দিয়ে লিখে···

প্রভা তাঁর দিকে চেয়ে বললে—আপনি চুপ করুন। আপনার সঙ্গে আমি কথা বলছি না, আমি যাঁর সঙ্গে কথা বলছি, তিনিই উত্তর দিন—

অধীর ব্যানার্জি বললে—দেখুন মিস্ চক্রবর্তী, আমি নিজেই একজন রিফিউজি, আমি সব ব্যাপারটা বুঝি। আমি যতটা বুঝি ততটা আপনিও বুঝবেন না। অনাথা বিধবা মায়ের হাত ধরে যেদিন এখানে আসি, সেদিন চোখে অন্ধকার দেখেছিলুম মনে আছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কিছু ভালো কাজও তো করেছে—

—কী ভালো কাজ করেছে, বলুন?

—এই যেমন জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছে। বাঙলা দেশে জমিদার বলতে আর কিছু নেই।

প্রভা গর্জে উঠলো। বললে—আপনার কত মাইনে মিস্টার ব্যানার্জি?

অধীর ব্যানার্জি উত্তরটা দিতে একটু দ্বিধা করতে লাগলো।

কিন্তু প্রভা তার আগেই বললে—ঠিক আছে, আপনি কত মাইনে পান, তা আমাকে বলতে হবে না। কিন্তু আপনারও তো ফ্যামিলি আছে। আপনি যা মাইনে পান তাতে আপনার স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের আপনি খাঁটি দুধ, টাটকা ফল, ওষুধ-ভিটামিন সবকিছু উচিত মত খাওয়াতে পারেন? আমি আমার কথা বলি। আমি বি.এ. পাশ। এখনকার অনেক বি.এ, এম.এ-র মত টোকা-টুকি করে পাশ করা নয়। রীতিমত বই পড়ে পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ। সেই আমি মাইনে পাই দু'শো কুড়ি টাকা। তার থেকে চল্লিশ টাকা ওই করুণাকান্তবাবুকে মাসে মাসে দিই। উনি ভালো বাড়িওয়ালা। সকাল-বিকেল আহ্নিক জপ-তপ করেন, ওঁর স্ত্রীও ঠাকুর নিয়েই আছেন সারাদিন। কলকাতায় সবাই তো আর এ-রকম বাড়িওয়ালা নয়। তা বাকি থাকে কত টাকা, বলুন? একশো আশি টাকা। একশো

আশি টাকায় আমি চালাতে পারি? আমার রিটায়ার্ড বুড়ো বাবা পাশের বারান্দায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছেন। ডাক্তার দুধ খেতে বলেছে, টাটকা ফল খেতে বলেছে, ভালো-ভালো ওষুধ-পত্র প্রেসক্রাইব্ করেছে, তার একটাও খাওয়াতে পারি না। টাকা খরচ করলেও তো পারার উপায় নেই। এখন তো কনট্রোল করার ফলে ওষুধ-ভিটামিন বাজার থেকে প্রায় উড়ে গেছে—

বলে প্রভা একটু দম নিলে যেন।

তারপর আবার বলতে লাগলো—হ্যাঁ, আপনি একটা কথা বলেছেন যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু সত্যি করে ভেবে দেখুন তো, সত্যিই কি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে? গ্রামের জমিদাররা চলে গেছে বটে, কিন্তু নতুন আর এক ধরনের জমিদার-ক্লাসের কি জন্ম হয়নি? এই আপনাদের লালবাজার থানার পুব দিকে যে বিরাট মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং হয়েছে দেখেছেন নিশ্চয়ই? ওই বাড়ির মালিক মাসে কত ভাড়া পায় তা জানেন? সাড়ে ছ' লক্ষ টাকা। তার মধ্যে ইণ্ডিয়া-গভর্ণমেণ্ট নিজেই একজন ভাড়াটে। ভাড়া দেয় মাসে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা! এইরকম কলকাতায় দিন-দিন কত বিরাট-বিরাট বাড়ি উঠছে। খবর নিয়ে দেখুন গে যে, এরাও নতুন ধরনের এক ক্লাসের জমিদার। তবু বলবেন জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছে?

অধীর ব্যানার্জি আমতা আমতা করে বলতে লাগলো—দেখুন ও-সব তো আমার জানবার কথা নয়, আমি তো সামান্য চাকরি করি···

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে হেরম্ববাবুর ছেলে ভবেশ বলে উঠলো—কিন্তু এই তো প্রিভি-পার্স উঠিয়ে দিলে গভর্ণমেণ্ট। তিনশো মহারাজা একেবারে রাতারাতি যেন পথের ভিখিরি হয়ে গেল। এটাও তো একটা ভালো কাজ করেছে ইন্দিরা গান্ধী··

—আপনি কোথায় চাকরি করেন জানি না। আপনি বোধহয় একজন ক্লাশ-ওয়ান গেজেটেড অফিসার। আপনার কথার উত্তরও

আছে আমাদের। একদিকে মহারাজারা যেমন গেল তেমনি আবার আর-একদিক থেকে নতুন-নতুন কত মহারাজা উঠেছেন, সে-খবর রেখেছেন?

হেরম্ববাবু বললেন—কী রকম?

—আপনি জানেন কী, দিল্লীর একজন মিনিস্টার কত মাইনে পায়?

সবাই চুপ করে আছে। কারো মুখে কোন জবাব নেই।

—বছরে চার লক্ষ আটচল্লিশ হাজার! এ আমার বানানো কথা নয়। মিস্টার ডান্‌ডেকারের স্টেট্‌মেণ্ট পড়ে দেখবেন।

—মিস্টাব ডান্‌ডেকার কে?

—সেকালের আই. সি. এস. অফিসার, আগে ছিলেন ইনকাম্‌-ট্যাক্স কমিশনার। এখন পার্লামেণ্টের মেম্বার। এটা তাঁর হিসেব। চাকর-আয়া বাগান জল ফার্নিচার-আলো সব মিলিয়ে আপনারাই হিসেব করুন না। এতে তো লুকোচুরি কিছু নেই। এরা কি মহারাজাদের চেয়ে কিছু কম? অথচ দেখুন উনিশ শো একষট্টি সাল পর্যন্ত এই মিনিস্টারদের সংখ্যা ছিল দু'শো চুরানব্বই, আর এই উনিশ শো সত্তরে বেড়ে হয়েছে চারশো পঁচানব্বই। এ কেন বাড়ে? আগে তাদের পেছনে যা খরচ হতো, এখন এই দশ বছরে তা বেড়ে বেড়ে ডবল হয়েছে। গরীব দেশের আর কিছু বাড়লো না, বাড়লো শুধু মিনিস্টারদের সংখ্যা? আপনি তবু বলছেন গভর্ণমেণ্ট শান্তি চায়?

অধীর ব্যানার্জির মুখ দিয়ে আর কোনও টুঁ শব্দ বেরোল না। আস্তে আস্তে নোট-বইটা আবার সে পকেট পুরে রাখলে।

তারপর বললে—আপনি তা হলে বলবেন না?

প্রভা বললে—না, আমার কথাগুলো আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন। শুধু জেনে রাখুন, যারা এই সব করছে তারা গুণ্ডা নয়। আপনার আমার মতই ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে। তাদের কেউ ইনজিনিয়ারিং পাশ, কেউ কেমেস্ট্রি অনার্স নিয়ে বিএস-সি

ফার্স্ট ক্লাশ, কেউ পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম.এ, এরা সব লেখাপড়া জানা ছেলে। বাড়িতেও বাপ-মায়ের কাছে এদের স্থান নেই, গভর্ণমেণ্টের চোখেও এরা ক্রিমিন্যাল। তাহলে এরা যাবে কোথায়? আমাকে এত পাষাণ ভাববেন না যে, নাম বলে দিয়ে এদের আমি জেলে পাঠিয়ে দেব—আমি তা পারবো না। আর আপনিও যদি বাঙালী হন, আপনারও যদি সংসার থাকে, ছেলেমেয়ে-স্ত্রী-পরিবার থাকে, আপনিও তা পারবেন না—

তারপর গলা নামিয়ে বললে—এখন যান, যা করবার করুন গিয়ে। পাশের বারান্দায় আমার বুড়ো বাবা অসুস্থ, আমি এখন তাকে খেতে দেব। তাঁর খাবার সময় হয়ে গেছে—আমিও চলি—

বলে সদর দরজাটা তাদের মুখের সামনেই আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিলে।

হেরম্ববাবু দেবসুন্দরবাবুর মুখের দিকে চাইলেন। বললেন—এ কী রকম গেছো মেয়ে রে বাবা, খুব খাসা মেয়ের জন্ম দিয়েছেন ভৈরববাবু—

করুণাকান্তবাবু বললেন—কী-রকম তেজ দেখলেন তো? এই রকম ভাড়াটে নিয়ে আমাকে এতকাল ঘর করতে হচ্ছে—

কিন্তু অধীর ব্যানার্জি কিছুই বললে না। কোথায় যেন তার বিশ্বাসের অস্তিত্বের মূলে গিয়ে একেবারে আঘাত করেছে মেয়েটা অধীর ব্যানার্জি সারাটা রাস্তা জিপের ভেতর চেপে যেতে যেতে সেই নিজের কথাই ভাবতে লাগলো। কী সে পেয়েছে, আর কী সে পায়নি! জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অভাব-অভিযোগগুলোর কথাও তার মনে পড়তে লাগলো। এতদিন চাকরি করে আসছে, কিন্তু এমন করে কখনও ডিউটি করতে এসে নিজের ভেতরেও তলিয়ে যায়নি। তার একটা মেয়ে। সেই মেয়েটাকেও কি সত্যি সে আর পাঁচজন সম্ভ্রান্ত লোকের মত সম্ভ্রান্ত কোনও স্কুলে পড়াতে পারছে? লালবাজার থেকে যা হুকুম এসেছে তাই তামিল করতে করতেই দিন-রাত

কেটে গিয়েছে। অথচ কার কোন্ উপকারটা সে করেছে এই শান্তি-রক্ষকের চাকরি নিয়ে? নিজের, পরের, সমাজের মানুষের কোন্ দুঃখটা সে ঘুচিয়েছে? মিস চক্রবর্তীর কথাগুলো যেন তখনও তীরের মত বিঁধছিল তার মনের পর্দায়। সে-সব যেন নতুন করে অধীর ব্যানার্জিকে ভাবিয়ে তুলেছে।

বাড়িতে ঢুকতেই মাধবী বললে—ওগো সব্বোনাশ হয়েছে—

—কী হলো?

—সুনুর তো জন্মদিন আজকে, তাই ওর রুলি-জোড়া পরিয়ে ওকে ইস্কুলে পাঠিয়েছিলুম। কে সে দুটো খুলে নিয়েছে।

অধীর ব্যানার্জি বললে—সোনার রুলি কখনও ছোট মেয়ের হাতে পরাতে আছে?

মাধবী রাগ করে বলে উঠলো—তা তুমি একটা ভালো ইস্কুলে মেয়েকে পড়াতে পারো না? এখানকার সবাই ইস্কুলের বাসে চড়ে পড়তে যায়। তোমার একটা মেয়ে, তুমি তাও পারো না? এই সামান্য টাকাও তুমি মেয়ের জন্যে খরচ করতে পারো না?

রাত্রে থানার ভেতরে নিজের ঘরে বসে সেই কথাগুলোই কেবল মনের মধ্যে গুঞ্জন করছিল। বাইরে লাল-সাদা জিপটা দাঁড়িয়ে আছে থানার গাড়ি-বারান্দার নিচে। দূর থেকে মাঝে মাঝে বোমা ফাটার শব্দ কানে আসছে। অন্যদিন এমন সময়ে অধীর ব্যানার্জি গাড়িটা নিয়ে বেরোয়। আজ আর তার বেরোতে ইচ্ছে করলো না। কী হবে বেরিয়ে? কী হবে ডিউটি করে? যে নিজের একমাত্র মেয়েকে একটা ভালো স্কুলেও পড়াতে পারে না, তার মুখে আবার এত বড় বড় কথা! তার আবার ডিউটি! কীসের ডিউটি সে করবে?

সুইং-ডোরটার বাইরে যেন কার গলার শব্দ শোনা গেল।

—আমি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই—

অধীর ব্যানার্জির ঘরের বাইরে ডিউটি দিচ্ছিল কনেস্টবল ছোট্টুলাল।

সে স্যালিউট্ করে ভেতরে ঢুকলো। বললে—হুঁজুর, একজন বুড়ো-মানুষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়—

—ভেতরে নিয়ে আয়--

ভৈরববাবু আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলেন। কিন্তু তাঁকে চেনবার উপায় নেই। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। গায়ে আলোয়ান জড়ানো। সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছেন।

—কে আপনি ?

—আমি থানার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

অধীর ব্যানার্জি বললে—আমিই বড়বাবু। কী বলবার আছে বলুন ? ওই চেয়ারে বসুন আপনি—

ভৈরববাবু বসলেন। বললেন—আমার নাম শ্রীভৈরব চক্রবর্তী। আমি রায়পুরে চাকরি করতুম, রিটায়ার করে এখন মেয়ের কাছে এসে উঠেছি। আমার মেয়ের নাম প্রভা, বারো নম্বর নস্কর-বাগান লেনে থাকে।

অধীর ব্যানার্জি প্রভার নাম শুনে এবার সোজা হয়ে বসলো।

বললে—আমি তো আজকে সকালে আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলুম—

ভৈরববাবু বললেন—হ্যাঁ, আমি তা জানি। কিন্তু পাছে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলি তাই আমার মেয়ে আমার ঘরের বারান্দার দিকের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছিল।

—তা এত রাত্তিরে এখন আপনার কী দরকার পড়লো ?

ভৈরববাবু বললেন—দেখুন, আমি এখানে লুকিয়ে এসেছি। মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি সেই ফাঁকে চুপি-চুপি বেরিয়ে এসেছি। মেয়ে জানে না।

—আপনার শরীর খারাপ বুঝি!

—হ্যাঁ, আমি নস্কর-বাগানের পার্কে দাঁড়িয়ে দু'একজনকে দু'চারটে

কথা শোনাচ্ছিলুম, হঠাৎ আমার মাথার ওপর কারা থান ইঁট ছুড়ে মারে। তারপরেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমার মেয়ে আমাকে এতদিন বাড়ি থেকে বেরোতে দিত না। আজ প্রথম বেরিয়েছে। না-বেরিয়ে পারিনি বলেই বেরিয়েছি। বলতে পারেন প্রাণের দায়েই বেরিয়েছি—

—প্রাণের দায় মানে?

ভৈরববাবু বললেন—বাঙলাদেশ তো আমার প্রাণের চেয়েও বড় মশাই। সেই দেশ এমন গোল্লায় যাবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। সেই দেশের ছেলেরা বাসে-ট্রামে উঠে ভাড়া দেবে না, বাস পুড়িয়ে দেবে, আবার গান্ধী-বিবেকানন্দ-সুভাষ বোসের অপমান করবে, এটা আমি সহ্য করি কী করে বলুন?

অধীর ব্যানার্জি ভালো করে দেখতে লাগলেন ভৈরববাবুকে। যার মেয়ে কিনা অত কথা শোনালো, সেই তারই বাপ এমন?

ভৈরববাবু বললেন—আমি বুড়ো মানুষ, তার ওপর অসুস্থ, কী বলতে কী বলে ফেলবো, তাতে কিছু মনে করবেন না। উনিশ শো চল্লিশ সালের দশ'ই মে তারিখে জার্মানীর হিটলার একদিন রাত তিনটের সময় হল্যাণ্ড আক্রমণ করেছিল, তা জানেন আপনি?

—হ্যাঁ, পড়েছি—

ভৈরববাবু বলতে লাগলেন—আমিও খবরের কাগজে পড়েছি। তা সেই সময় যখন হল্যাণ্ড লড়াই করবার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন হঠাৎ সমস্ত দেশের ইলেকট্রিক লাইট্ নিবে গেল। সে একেবারে বিপর্যয় কাণ্ড। কী হলো, কী হলো রব উঠলো চারদিকে। এ কার কাজ? এ ফিফথ্ কলাম্‌নিষ্ট কেউ? কে এই দেশের শত্রুতা করলে? খোঁজ খোঁজ, খুঁজে বার কর—

বাইরে ছোট্টুলাল সব শুনতে লাগলো। তারপর আর সেখানে দাঁড়ালো না। একটা সাইকেল নিয়ে পাঁই-পাঁই করে দৌড়ুলো উত্তর দিক বরাবর।

তারপর অন্ধকার হাতড়ে একেবারে রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের

বস্তিতে গিয়ে পৌঁছুলো। তাবপর একটা দরজাব সামনে গিয়ে ডাকলে—সমরদা, সমরদা—

খট করে দরজাটা খুলে গেল।

সমর বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো।

—কী বে ছোট্টু, কী খবর ?

—সব্বোনাশ হয়েছে সমরদা। একজন থানায় এসে সব ফাঁস করে দিয়েছে। এখনও থানায় আসামী বসে আছে। বড়বাবুকে সব ফাঁস করে দিচ্ছে! এখখুনি চলো—

সমর বললে—জোয়ান না বুড়ো ?

ছোট্টুলাল বললে—মুখ দেখতে পাইনি, আগাগোড়া আলোয়ান ঢেকে এসেছে—

শুধু সমর নয়, আবো অনেকে সঙ্গ নিলে। হাত-বোমা, ছোরা, গুপ্তি, সব আলোয়ানের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল।

সমর বললে—তুই সাইকেলে করে আগে আগে গিয়ে ঘাঁটি আগ্লা গে, যা—

ছোট্টুলাল যেমন এসেছিল, আবার তেমনি পাঁই-পাঁই করে সাইকেলে চড়ে চলে গেল। সে আগে গিয়ে মওড়া নেবে!

বড়বাবুর ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে ভৈরববাবু তখনও কথা বলে যাচ্ছিলেন।

অধীব ব্যানার্জি বললে—কিন্তু আপনাব মেয়ে যে অন্য কথা বললে ?

ভৈরববাবু বললেন—আমার মেয়ে বলুক গে। আমার মেয়ে কী বোঝে! ওব তো মা ছিল না। আমিই ওকে ছোটবেলা থেকে কোলে-পিঠে কবে মানুষ করেছি। আমাব চেয়ে আপনি ওকে বেশি চেনেন ?

—কিন্তু মিস চক্রবর্তী যে কথাগুলো বললে তাও তো মিথ্যে নয়! এই আমারই ব্যাপার দেখুন না, আমি এ-থানার ও-সি আমি কত মাইনে পাই ? আমার একমাত্র মেয়েকেও আমি ভালো

ইস্কুলে ভর্তি করতে পারিনি। অথচ দেখুন বড় বড় লোকদের ছেলে-মেয়েরা ইংরাজি স্কুলে পড়ছে। জহরলাল নেহরুর নাতিরাও তো সব ইংলণ্ডে মানুষ হয়েছে। আমরা গরীব বলেই কি আমাদের এত দুর্গতি ?

ভৈরববাবু বললেন—আমি তো বলছি আপনাকে, ওর কথা শুনবেন না। আমাদের এ দেশ ধর্মের দেশ। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীব দেশ। বামমোহন, পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, সুভাষ বোসের দেশ। এ হলো ত্যাগের দেশ। এ দেশে পাপী-তাপীর ধ্বংস করতে যুগে যুগে অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমরা কেবল কর্তব্য করে যাবো। কর্ম করে যাবো। কর্মফলেব ওপব আমাদের কোনও অধিকার নেই। সততা সত্যবাদিতা এইসবের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের দেশ গড়ে উঠেছে। আপনি ওর কথায় কান দেবেন না। আপনার ওপর যে কর্তব্য ন্যস্ত আছে, তাই-ই করে যান। দেখবেন, তাতে আপনার ভাল হবে, তাতে সকলের ভালো হবে, তাতে এই হতভাগ্য দেশেরও ভালো হবে—

অধীর ব্যানার্জি বললে—কিন্তু আপনি তো বলছেন এ-সব কথা—এ-সব খুবই ভালো কথা। বইতে এ-সব কথা ছাপাব অক্ষরে লেখা থাকে। আমিও পড়েছি। কিন্তু আজকে গুণ্ডা বলে যাদের ধরছি তারাই যদি আবার কাল জাল ভোটে জিতে মিনিস্টাব হয়, তখন ? তখন যে আমাদেরই ওপর যত চাপ পড়বে।

ভৈরববাবু বললেন—কিন্তু মহাপুরুষদের বাণী কি তাহলে মিথ্যে হবে বলতে চান দারোগাবাবু ?

অধীর ব্যানার্জি বললে—আপনারা সে-কালের মানুষ, সেকালের রীতি-নীতি ধর্ম-অধর্ম মেনে চলছেন। যখন মহাপুরুষরা ও-সব বাণী লিখে গেছেন, তখন তো ভোট ছিল না। এ-ভোট যে কী ভয়ানক বস্তু তা তো আপনি জানেন না ভৈরববাবু। নামে এটা 'সিক্রেট'। আসলে সবাই জানতে পারে, কে কাকে ভোট দিলে। তাতে

আমাদেরই হয়েছে বিপদ—

—কেন? বিপদ কেন?

—সে আপনি বুঝবেন না। সে কেউই বোঝে না। আজকে গুণ্ডামির অপরাধে যদি কাউকে অ্যারেস্ট করি, কাল যখন সে আবার মিনিস্টার হবে তখন আমার চাকরি নিয়েই টানাটানি করবে। এখন খুন করলেও কাউকে আমরা হঠাৎ অ্যারেস্ট করতে পারি না।

ভৈরববাবু বললেন—তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী হবে?

—কী হবে তা আপনি কল্পনা করে নিন! আমি যদি অনেস্ট হই তো আমার ফ্যামিলিকে উপোস করতে হবে: আব নয় তো আমি খুন হবো—

ভৈরববাবু বললেন—তাহলে এই যে আমি এত রাত্রে জ্বর নিয়ে আপনাব কাছে এলুম, আপনি এর কোনও প্রতিকার করবেন না?

—না।

—আমি তার নাম বলছি, তার চেহারার বর্ণনা দিচ্ছি, তবু তাকে আপনি অ্যারেস্ট করবেন না?

—আপনি তার নাম জানলেন কী করে?

—আমি যে শুনেছি আমার বাড়িতে। অনেক রাত্রে যখন আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন তারা আমার মেয়ের কাছে আসে। আমার মেয়ে তো তাকে ‘সমর’ বলে ডাকে। মাঝে-মাঝে দু-চারটে করে টাকা দেয়। দেখেছি হলদে সার্ট, আঁট প্যাণ্ট, লম্বা জুলফি···

অধীর ব্যানার্জি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বললে—আপনি বাড়ি যান ভৈরববাবু, অনেক রাত হয়ে গেল। আপনার মেয়ে যদি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে তো জানতে পারবে আপনি থানায় ডায়েরি করতে এসেছেন—

ভৈরববাবু রেগে গেলেন। বললেন—জানতে পারুক গে। আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি? মেয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে

এসেছি, তার কারণ মেয়ে জানতে পারলে আমাকে ঘরে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখতো। কিন্তু তা বলে সত্যি কথা বলতে কি আমি ভয় পাবো ভেবেছেন? আমার জীবন বড় না সত্য বড়? 'সত্যে'র জন্যে আমি জীবন দিতে পারি, তা জানেন?

অধীর ব্যানার্জি বললে—আপনি পারেন কিন্তু আমি পারি না। আমি সাধারণ গৃহস্থ মানুষ। আমাব বউ-মেয়ে আছে, আমায় চাকরি করে খেতে হয়—

—তাহলে কিন্তু কালই আমি আপনার ওপরওয়ালার কাছে যাবো। আপনার পুলিশ কমিশনারের কাছে যাবো লালবাজারে—সেখানে গেলে নিশ্চয়ই এর প্রতিকার হবে-

অধীর ব্যানার্জি বললে -ভুল কথা। তিনিও গৃহস্থ মানুষ। তাঁরও বউ, ছেলেমেয়ে আছে, তাঁকেও চাকরি কবে খেতে হয়, তাঁকেও চাকরির প্রমোশনেব কথা ভাবতে হয়। আবার যখন ভোট হবে, তখন আবার কোন্ পার্টি হোম মিনিস্ট্রি পেয়ে যাবে তা ভেবে কাজ করতে হয়।

—তাহলে আমি কার কাছে যাবো? কাব কাছে গিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার চাইবো?

অধীর ব্যানার্জি বললে—আমাদের কেউ নেই ভৈরববাবু, আমবা অসহায়, হেলপ্‌লেস—

—তাহলে কি বাঙালী জাত মরে যাবে? রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের জাত এমনি করেই ধ্বংস হবে?

—আমাদের মুখে তাঁদের মত মহাপুরুষের নাম উচ্চারণ করাও পাপ। মহাপাপ। দয়া করে বার বার ওঁদেব নাম আর উচ্চারণ করবেন না। আপনি বাড়ি যান—

ভৈরববাবু ভালো করে মাথায় গায়ে আলোয়ানটা জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন।

রাস্তায় আসতে আসতে তাঁর মনে হলো, সত্যিই বোধহয় দেশটা গোল্লায় গেল। বিদ্যাসাগরমশাই শেষের দিকে বলে গিয়েছিলেন—

'এ পোড়া বাংলাদেশের আর কোনও আশা নেই, এ-জাত গোল্লায় গেল।' আজ ভৈরববাবুরও তাই মনে হলো। একটা সত্যি কথা বলার সাহস নেই কারো, সত্যবাদিতাও চলে গেল! তাহলে আর রইলটা কী? বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সুভাষ বোস তাঁরা সবাই মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। এই অধঃপতন তাঁদের আর চোখে দেখে যেতে হয়নি।

রাত অনেক হয়েছে। নস্কর-বাগান থেকে এমনিতেই কেউ সন্ধ্যের পর পারতপক্ষে রাস্তায় বেরোয় না। তার ওপর এখন রাত কত হয়েছে কে জানে! আসবার সময় ভৈরববাবু প্রভার ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসেছেন। আবার গিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঢুকতে হবে। তারপর প্রভা জানতে না পারে এমন ভাবে দরজায় খিল বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু মনটা তবু বিক্ষিপ্ত হয়ে রইল। শুধু যে অন্যায় করে সে-ই নয়, অন্যায় যে সয় সে-ও তো সমানভাবেই অপরাধী। পাড়ায় এতগুলো লোক রয়েছে তবু কারো সত্যি কথা বলবার সাহস নেই। তাঁর শরীর খারাপ না হলে তিনি তো আগেই গিয়ে পুলিশের সামনে গুণ্ডাদের নাম-ধাম বলে দিতেন। নস্কর-বাগান লেনে কি একজনও সৎ মানুষ নেই?

—কে?

কিন্তু 'কে' কথাটা তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবার আগেই কারা যেন তাঁর ওপর ঝাপিয়ে পড়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেছেন। তখন আর জ্ঞান নেই তার।

—প্রভাদি, প্রভাদি—

চুপি চুপি গলায় ডেকেছে যাতে বাইরের লোক কেউ শুনতে না পায়। কিন্তু যাকে ডাকা সে ঠিক শুনতে পেয়েছে। ধড়-মড করে জেগে উঠেছে প্রভা। আবার বোমার ঘা লেগে কেউ মরেছে নাকি?

—প্রভাদি, আমি সমর, তোমার দরজা খোলা কেন?

তাইতো! সদর দরজাটা বন্ধ করেই তো সে শুয়েছিল। খুললে কে?

সমর হঠাৎ বলে উঠলো—আমাকে তুমি ক্ষমা করো প্রভাদি, আমি খুব অন্যায় করে ফেলেছি—

ভোলা, কার্তিক তারাও তখন মাথা নিচু করে পাশে দাড়িয়ে ছিল। তাদের মুখের দিকে চেয়ে প্রভা অবাক হয়ে গেল। অন্ধকার ঘর। বাইরে রাস্তার গ্যাসের আলোয় তাদের চেহারাটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। সবাই যেন কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে।

প্রভা বললে—কী হলো রে তোদের? ক্ষমা করবো কী জন্যে?

—দাদুকে খতম করে দিয়েছি প্রভাদি। আমি চিনতে পারিনি। হাট্টুলাল আমাকে বলেছিল···

—কী বলেছিল? শিগ্‌গির বল?

—বলেছিল কে একজন থানায় গিয়ে বড়বাবুকে আমাদের নাম-ধাম বলে দিচ্ছে। তাই শুনেই তো দৌড়ে গেলুম। তখন আর ভাববার সময় ছিল না।

প্রভা একটা চাদর জড়িয়ে নিলে গায়ে। বললে—চল্, দেখি কোথায় বাবা—

সমর, ভোলা, কার্তিক তারা আগে আগে চললো। নস্কর-বাগান লেন তখন আরো জনশূন্য। রাস্তার আলোগুলো কুয়াশার ঘেরাটোপ পরে আরো ঝাপসা হয়ে গেছে তখন। প্রভার মনে হলো যেন সমস্ত কলকাতাটা একটা অনন্ত বিস্তৃত সাদা মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে। আর সেই মরুভূমির মধ্যে যেন মাঝে-মাঝে জেগে উঠছে একটা মৃগতৃষ্ণিকা। আশার, ভবিষ্যতের আর সূর্যোদয়ের মৃগতৃষ্ণিকা। এই কলকাতা, এই বাংলাদেশ অনেকদিন ধরেই ধুঁকছিল। মুমূর্ষুর মত মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে শেষ প্রহরের জন্যে মুহূর্ত গুনছিল। আজ বুঝি সেই মুহূর্ত গোনা তার শেষ হলো। চাদরের ঘোমটাটা টেনে নিয়ে একবার আকাশের দিকে চাইলে সে। আকাশের এককোণে ধ্রুবতারাটা তখন জ্বলজ্বল করছে। জ্বলজ্বল করে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে এদের মুখের দিকে। যেন বলছে—'অমৃতের সন্তান' কথাগুলো সমস্ত মিথ্যে। ও-সব ঋষি-মহাঋষিদের স্তোকবাক্য। ও-সব কথা তোমরা ভুলো না। এটা বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ। ওরা আজ বিজ্ঞান দিয়ে যুক্তি দিয়ে আমার পেছনেও ধাওয়া করতে আসছে। আজ বিজ্ঞানই সত্য, ঋষি-বাক্য মিথ্যে। উপোষী মানুষের কাছে আবার শাস্ত্রের উপদেশ কী? সে তো উপহাসেরই নামান্তর। তোমরা বুভুক্ষু মানুষ, তোমরা বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের কথা শুনো না। সবার উপরে মানুষ সত্যি। শুধু মানুষ সত্যি তা-ই নয়। সেই মানুষের ষোল আনাই সত্যি। তার স্বপ্ন সত্যি, তার ক্ষুধা সত্যি, তার বিলাসিতা সত্যি, তার হিংসে, ক্রোধ, লোভ, মোহ, কাম সবটুকুই সত্যি।

—ওই যে ওখানে!

সেই ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যেই স্পষ্ট দেখা গেল বাবার মৃতদেহটা মাঝ রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে নস্কর-বাগান লেন। রক্তটা গড়িয়ে গড়িয়ে যেন একটা ইণ্ডিয়ার ম্যাপ তৈরি করে চলেছে।

সমর, ভোলা, কার্তিক—তাদের মুখেও তখন আর কথা নেই। যে

ভোরবেলা থানাব একজন কনেস্টবল দৌড়তে দৌড়তে থানায় গিয়ে পৌঁছেছে।

—হুজুর, আর একটা খুন!

—কোথায়?

—নস্কর-বাগান লেনে।

বড়বাবু রিভলবারটা নিয়ে আবার দৌড়লো।

কিন্তু বাড়িতে দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যে প্রভা তখন নিজের বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে হাউ-হাউ করে নিঃশব্দে কাঁদছে। সমর, ভোলা, কার্তিক তারাও এতক্ষণ ছিল।

সমর বললে—আমাদের তুমি ক্ষমা করো প্রভাদি, আমরা ভুল করেছি, বুঝতে পারিনি। চিনতে পারিনি—

—না, তোরা ভুল করিসনি, ঠিক করেছিস—

ওরা চলে যেতেই প্রভা ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে বিছানার ওপর ভেঙে পড়েছিল।

সেদিনও সন্ধ্যেবেলা যথারীতি রেডিও বাজতে সুরু করলো। নস্কর-বাগান লেনের বাইরে যা-ই ঘটুক, ভেতরে তখনও ঘরে-ঘরে সবাই রেডিওতে কান পেতে রয়েছে। শুধু ভৈরববাবুই নেই। দেবসুন্দরবাবু, করুণাকান্তবাবু, হেরম্ববাবু, সকলেরই মনে পড়তে লাগলো ভৈরববাবুর কথাগুলো। ভৈরববাবু বলতেন, প্লেটো বলে গেছেন—The punishment that the wise and good men of a country, who decline to take interest in the affairs of their

country, must suffer—is to be gladly ruled by the rest, vi/ fools and knaves.

হঠাৎ রেডিওতে ঘোষণা হলো—এতক্ষণ আপনারা হিন্দী ফিল্ম-সঙ্গীত শুনছিলেন। এবার শুনুন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের খেয়াল—রাগ ভৈরব—

সেদিন সন্ধ্যের পর থেকেই নস্কর-বাগানে কারফিউ জারি হয়ে গেল।

—